ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুতেই ইসলামের জীবন

শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান

প্রকাশনায় ঃ
প্রকাশনা বিভাগ
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

প্রথম প্রকাশ ঃ
সফর - ১৪১৪
শ্রাবণ - ১৪০০
আগষ্ট - ১৯৯৩

৬ষ্ঠ সংস্করণ ঃ (বর্ধিত)
সফর - ১৪২৩
বৈশাখ - ১৪০৯
মে - ২০০২

মুদ্রণে ঃ
ইন্টারকন এসোসিয়েট্স

Eisa (As.)-er Mrittutei Islamer Jibon
(Life of Islam at Jesus' Death)
By : Shah Mustafizur Rahman

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

ভূমিকা

হযরত ঈসা নাসেরী (আঃ)কে ইংরেজ তথা খৃষ্টানরা খোদার পুত্র খোদারূপে উপাসনা করে। তাদের ত্রিত্ববাদের অন্যতম সেই 'খোদার' পুনরাগমনের প্রতীক্ষায় তাদের সঙ্গে বহু মুসলমানও তাকিয়ে আছে শূণ্যে-আকাশের দিকে। তবে, তারা সবাই হতাশ হবে। কারণ, সব খৃষ্টান ও ইংরেজদের সেই 'খোদার' মৃত্যু প্রমাণ করে তাঁর কবর দেখিয়ে দিয়েছেন কাশ্মীরে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)। ফলে, এ সম্পর্কে আল্-কোরআনে বর্ণিত সত্য প্রমাণিত হয়েছে, এবং আঁহযরত (সাঃ)-এর সেই শক্তিশালী ভবিষ্যদ্বানী পূর্ণ হয়েছে যাতে বলা হয়েছে যে, তাঁর (সাঃ) উম্মতের প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী (আঃ) হবেন ক্রুশভঙ্গকারী।

ইহুদীদের বিশ্বাস ঃ যীশুকে তারা ক্রুশে লটকিয়ে বধ করেছে। অতএব সে অভিশপ্ত ;

খৃষ্টানদের বিশ্বাস ঃ ক্রুশে অভিশপ্ত মৃত্যু বরণ করলেও যীশু ৩ (তিন) দিন পর আবার জীবিত হয়ে তাঁর পিতার কাছে উঠে গেছেন ;

বহু মুসলমানের বিশ্বাস ঃ ক্রুশে লটকাবার পূর্বেই যীশুকে আকাশে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে।

এই সব অলীক বিশ্বাসগুলোই ক্রুশীয় বিশ্বাস। এগুলোকে মিথ্যা ও জাল প্রমাণিত করার নামই ক্রুশ ভঙ্গ করা। এবং তা সম্ভব তখনই যখন প্রমাণিত হয় যে, ঈসা (আঃ) বা যীশুর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। এই বিষয়টির তাৎপর্য নিয়ে এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন জনাব শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান। এই প্রবন্ধ প্রকাশনায় তাঁকে এবং যাঁরা সহযোগিতা করেছেন, তাঁদেরকে আল্লাহ্তাআলা যাযায়ে খায়ের দান করুন। উপর্যোপরি চাহিদার কারণে আমরা প্রবন্ধটির বর্তমান ৬ষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশ করছি। বিস্তারিত জানতে চাইলে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের যে কোন কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

আল্লাহ্পাক সবাইকে সৎ পথে পরিচালিত করুন। আমীন।

ঢাকা
মে, ২০০২ইং

খাকসার
আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আঃ) বলেছেনঃ

" স্মরণ রাখিও, কেহ আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইবে না। আমাদের সকল বিরুদ্ধবাদী, যারা আজ জীবিত আছে, তাহারা সকলে মরিবে, কিন্তু তাহাদের মধ্য হইতে কেহই মরিয়মের পুত্র ঈসা (আঃ)-কে আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইতে দেখিবে না। অতঃপর তাহাদের সন্তানেরাও মরিবে, কিন্তু তাহাদের মধ্য হইতেও কেহ মরিয়মের পুত্র ঈসা (আঃ)-কে আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইতে দেখিবে না। অতঃপর তাহাদের সন্তানদের সন্তানেরাও মরিবে, কিন্তু তাহারাও মরিয়মের পুত্রকে আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইতে দেখিবে না। তখন বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এই বিশ্বাসের প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া পড়িবে। এবং আজ হইতে তৃতীয় শতাব্দী পূর্ণ হইবে না যখন ঈসা (আঃ)-এর অপেক্ষাকারীরা, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, সকলে অত্যন্ত হতাশ ও বিরক্ত হইয়া ঐ মিথ্যা বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করিবে । তখন পৃথিবীতে একটিই ধর্ম হইবে এবং একই নেতা। আমি তো এক বীজ বপন করিতে আসিয়াছি। সুতরাং আমার দ্বারা ঐ বীজ বপন করা হইয়াছে। এখন ইহা বৃদ্ধি লাভ করিবে এবং বিকশিত হইবে। কেহ ইহাকে রুখিতে পারিবে না"

(তাযকেরাতুশ্শাহাদাতাইন পুস্তক থেকে)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

(এক)

কুরআন শরীফে সূরা সাফ্ফ-এর ৭ আয়াতে বলা আছে ঃ

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَمُبَشِّرًاۢ بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِي اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ

"এবং (স্মরণ কর) যখন মরিয়মের পুত্র ঈসা বলিয়াছিল, 'হে বনী ইসরাঈল! নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র রসূল, উহার (ভবিষ্যদ্বাণীর) সত্যায়নকারীরূপে যাহা তওরাত হইতে আমার সম্মুখে আছে, এবং এমন এক রসূলেরও সুসংবাদদাতারূপে, যে আমার পরে আসিবে, তাহার নাম হইবে আহমদ"।

কোরআন করীমের এই আয়াত থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ঈসা (আঃ) তওরাতের উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলির সত্যায়ন করবেন এবং তিনি নিজেও এই সুসংবাদ দিবেন যে, হযরত মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আগমন হবে তাঁর (আঃ) পরে। ঈসা (আঃ)-এর এই (৬১ঃ৭) ভবিষ্যদ্বাণীর একাধিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কিন্তু তন্মধ্যে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে, তিনি এখানে আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন। কিন্তু এখন যদি এই কথা বিশ্বাস করা হয় যে, ঈসা (আঃ) আজও পর্যন্ত মারা যান নি, বেঁচেই আছেন এবং তাঁর জীবদ্দশাতেই রসূলে পাক (সাঃ) জন্ম গ্রহণ এবং মৃত্যুবরণ করেছেন, তাহলে খৃষ্টান পাদ্রীদের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। অথচ, মানবেতিহাসের সর্বাপেক্ষা সত্য তথ্য হচ্ছে-, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর

শুভাগমন ঘটে গেছে এই পৃথিবীতে। অতএব, যে ব্যক্তি আমাদের প্রাণাধিক প্রিয় নেতা ও প্রভু মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামকে সত্যিসত্যিই মানেন ও মানবেন তাঁকে সাথে সাথে একথাও মানতেই হবে যে, ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর পরেই রসূলে পাক (সাঃ)-এর আগমন ঘটেছে। অন্যথায় (আল্লাহ্ না করুন) তাকে কোরআন শরীফ থেকে সূরা সফ্‌ফের ঐ আয়াতটি মুছে ফেলতে হবে।

আল্লাহ্‌র কথা মতে-

ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু না হলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের আগমন হয় না (৬১ঃ৭)। অতএব,

ঈসা (আঃ) আজও পর্যন্ত বেঁচে আছেন বলে যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরা অজ্ঞাতে অথবা প্রকারান্তরে খৃষ্টান পাদ্রীদের সেই মিথ্যা কথাটাই সমর্থন করেন যে, এখনও পর্যন্ত প্রতিশ্রুত সেই নবী, সেই প্যারাক্লিত, সেই আসল মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আগমন ঘটেনি। মুসলমানরা এখন যে মুহাম্মদকে মানে (নাউযুবিল্লাহ্) সে ভন্ড, সে প্রতারক, মিথ্যাবাদী, সে খৃষ্ট-বিরোধী, সে দাজ্জাল (নাউযুবিল্লাহ্-আল্লাহ্‌র পানাহ্ ও আশ্রয় চাই)

হযরত মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম)-এর আগমন সম্পর্কে বাইবেলে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী ও প্রতিশ্রুতি আছে খৃষ্টান পাদ্রীরা সে সকল মানে না, বরং সেগুলির বিকৃতি সাধন করে এবং মনগড়া অর্থ ও ব্যাখ্যা করে। বাইবেলের পুরাতন নিয়ম অর্থাৎ তওরাতে আছে যে, আঁহযরত (সাঃ)-এর আগমন ঘটবে বনী ইসরাঈলের বংশে নয়, বরং তাদের ভাই বনী ইসমাঈলের বংশে। যেমন, দ্বিতীয় বিবরণে আছে ঃ

> "আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিব, ও তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব; আর আমি তাঁহাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিব, তাহা তিনি উহাদিগকে বলিবেন। আর আমার নামে তিনি আমার যে সকল বাক্য বলিবেন তাহাতে যে কেহ কর্ণপাত না করিবে,তাহার কাছে আমি পরিশোধ লইব।" (১৮ ঃ ১৮)

খোদাতা'লার এই পরিশোধ গ্রহণের ভয়ে ভীত হওয়া তো দূরের কথা ইহুদী ও খৃষ্টানরা এই ঐতিহাসিক সত্যটা বিশ্বাসই করে না যে, মক্কার

কোরেশরা হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর। তদুপরি, তারা বলে থাকে যে, হযরত হাজেরা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর স্ত্রী ছিলেন না, ছিলেন এক দাসী। অতএব, তাদের কথা হলো মুহাম্মদ, যে আরবে জন্ম গ্রহণ করেছে সে ইসমাঈলের বংশধর নয়। আর হলেও কিছু যায় আসে না, কেননা ইসমাঈল ছিল দাসীপুত্র সুতরাং সে উহাদের ভ্রাতৃগণের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। যদিও ঐতিহাসিক সত্য এটাই যে, হযরত হাজেরা ছিলেন মিশরের রাজ পরিবারের মেয়ে এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিবাহিতা স্ত্রী। কিন্তু ইহুদী খৃষ্টানরা তা মানে না, এবং মানে না বলেই হযরত রসূলে পাক (সাঃ)-কেও মানে না, বরং তাঁর সর্বোত্তম পবিত্র সত্তা ও চরিত্রের বিরুদ্ধে যত খুশী নাপাক কথা বলেছে এবং এখনও বলছে।

বাইবেলের নতুন নিয়মে (এখন তারা যাকে ইঞ্জিল শরীফ নামে বিপুল সংখ্যায় ছড়াচ্ছে) আছে যে, ভ্রাতৃগণের মধ্যেকার সেই নবীর (যোহন ঃ ১ঃ২১), কম্ফর্টারের (Comforter), সত্যের আত্মার আগমন ঘটবে যীশুর পরে। যেমন বলা আছে ঃ

> "তথাপি আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল কারণ আমি না গেলে সেই সহায় (Comforter-শান্তিদাতা) তোমাদের নিকটে আসিবেন না; কিন্তু আমি যদি যাই তবে তোমাদের নিকটে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব। ....
>
> .... কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনেন, তাহাই বলিবেন, এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন। তিনি আমাকে মহিমান্বিত করিবেন"। (যোহন-১৬ঃ৭-১৪)।

দ্রষ্টব্যঃ হাবাক্কুক-৩ঃ৩-৭; সলোমনের সঙ্গীত-৫ঃ১০-১৬; যিশাইয়-৯ঃ৬-৭; মথি-২৩ঃ৩৮,৩৯; যোহন-১৪ঃ২৬; ইত্যাদি।

বাইবেলের এই সকল ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর আবির্ভাব ঘটবে যীশু বা ঈসা (আঃ)-এর একেবারে চলে যাবার পরে। এখন যদি বলা হয় যে, ঈসা (আঃ) আজও অব্দি বেঁচে আছেন, মারা যান নি, তাহলে কি পাদ্রীদের ঐ মিথ্যা কথাটাই সমর্থন করা হয় না যে, প্রকৃত শান্তি দাতা, পবিত্র আত্মা, মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আগমন আজও পর্যন্ত ঘটেনি, যাঁকে মান্য করা হচ্ছে তিনি (নাউযুবিল্লাহ) ভন্ড, মিথ্যাবাদী ?

(দুই)

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের পূর্বে আগমনকারী কোন নবীই পূর্ণ শরীয়তধারী ছিলেন না, আন্তর্জাতিকও ছিলেন না। আঁহযরত (সাঃ)-এর পূর্ববর্তী শরীয়তওয়ালা নবী এবং সেই সুবাদে তাঁর (সাঃ) সদৃশ নবী ছিলেন হযরত মূসা (আঃ)। মূসা (আঃ)-এর পরবর্তী বনী ইসরাঈলী সকল নবীই ছিলেন জাতি, গোত্র বা গোষ্ঠীভিত্তিক। মূসায়ী শরীয়তের অধীন সর্বশেষ নবী ছিলেন ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ)। বনী ইসরাঈল ছিল ১২ (বার)টি গোত্রে বিভক্ত। এদের মধ্যে মাত্র দু'টি গোত্র ছিল প্যালেস্টাইনে, বাকী দশটি ছিল ইরান, আফগানিস্থান ও হিন্দুস্থানের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। এরাই বনী ইসরাঈলের হারানো মেষ। আল্লাহ্ নবী প্রেরণ করেন এবং তাঁর প্রতি দায়িত্ব অর্পণ করেন স্বীয় তওহীদ ও ধর্ম প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের জন্য। নবী তাঁর দায়িত্ব পালন সম্পন্ন করবার পর পরলোক গমন করেন ও আল্লাহ্র কাছে চলে যান। ক্রুশের ঘটনা পর জেরুসালেম থেকে ঈসা (আঃ)-এর অন্তর্ধান ঘটেছিল তাঁর মাত্র ৩৩ (তেত্রিশ) বছর বয়সে। ঈসা (আঃ)-এর জীবনের এই সংকীর্ণ ইতিহাসটুকু মোটামোটি জানা আছে। বাকী পরবর্তী ইতিহাস সবার জানা নেই। ঈসা (আঃ)ও নেই। কাজেই, বলা হয় যে, ঈসা (আঃ) তাঁর নবুওয়তের দায়িত্ব পূর্ণরূপে পালন করার পূর্বেই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। অতএব, তাঁর সেই আরদ্ধ কর্ম সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন করার জন্য পুনরায় তাঁর আগমন ঘটবে। এক্ষেত্রে, খৃষ্টানদের দাবী হলো তিনি পুনরায় আগমন করে তওরাত ও ইঞ্জিলের ধর্মই প্রতিষ্ঠা করবেন। পক্ষান্তরে, মুসলমানদের দাবী হচ্ছে যে, না তিনি কোরআনের ধর্ম প্রতিষ্ঠার কাজ করবেন। এক্ষেত্রে বলাই বাহুল্য, নিরপেক্ষ বিচারক খৃষ্টানদের পক্ষেই রায় দান করবেন। কারণ, ঈসা (আঃ)-এর আগমন ঘটেছিল শুধু বনী ইসরাঈলের জন্য, অপর কোনও জাতির জন্য নয়। অপর কোনও জাতির কাছে ধর্মপ্রচারের কোন অধিকার তাঁর ছিল না। পাদ্রীরা যে অপরাপর জাতিগুলির কাছে তাদের ধর্ম প্রচার করে বেড়ায়, তাতে একদিকে তাদের যেমন কোন অধিকার নেই, তেমনি অপরদিকে তাদের প্রচারিত ত্রিত্ববাদ আসলে খৃষ্টধর্মই নয়, বরং তা জর্জ বার্ণাড শ'-এর কথায় ক্রুশধর্ম (Crosstianity). তথাপি যদি মনে করা হয় যে, ঈসা (আঃ) আবারও আসবেন তাঁর বাকী কর্তব্য সমাধা করার জন্য, তাহলে মানতে হবে যে, তিনি আসবেন কেবল বনী ইসরাঈলের জন্য অন্য কারো জন্যে নয়। কেননা, খোদা তাঁকে অপর কোন জাতির কাছে ধর্ম প্রচারের অধিকার দান করেন নি।

যীশুর দাবী হচ্ছেঃ 'ইস্রায়েলকুলের হারানো মেষ ছাড়া আর কাহারও নিকটে আমি প্রেরিত হই নাই।" (মথি-১৫ঃ২৪)।

(তিন)

আপনি হয়তো বলবেন, তবে যে আমাদের আলেমরা অনেকেই বলে থাকেন যে, ক্রুশের ঘটনায় হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্তা'লা আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং তিনি আকাশে জীবিত আছেন এবং আখেরী যামানায় ভূ-পৃষ্ঠে অবতীর্ণ হয়ে দীন ইসলামের খেদমতে আত্মনিয়োগ করবেন ?

প্রথম কথা হলো, এসব কথার একটিও পবিত্র কোরআনে নেই।

তবে হ্যাঁ, আলেমদের অনেকেই এসব কথা বলে থাকেন, কিন্তু কথাগুলো ঠিক নয়। ঠিক নয় কারণ, -

– ক্রুশে মারা যাওয়ার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আল্লাহ্ ঈসা (আঃ)-কে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং তিনি অদ্যাবধি আকাশেই পানাহার ও প্রাকৃতিক প্রয়োজনাদির উর্ধ্বে থেকে কোথাও জীবিত আছেন, মারা যাননি,- এই বিশ্বাসটা প্রচলিত খৃষ্টানী আকিদাকেই জোরদার করে। কেননা, এতে প্রমাণিত হয় যে, ঈসা (আঃ) মানবাতীত সত্তার অধিকারী এবং তিনি সকল নবী রসূলের চাইতে বড়, তাঁর মর্যাদা সকলের উপরে, অতএব তিনি খোদার পুত্র।

নবী রসূলগণের প্রত্যেকের জীবনে কোন না কোন ভয়ানক বিপদ এসেছিল, এবং তাঁরা প্রত্যেকেই সেই বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছেন খোদার মেহেরবানীতে এই পৃথিবীতেই। এতে একদিকে যেমন প্রমাণিত হয়েছে তাঁদের প্রত্যেকের খোদার প্রতি প্রেম, আনুগত্য, ধৈর্য ও দৃঢ়তা- এস্তেকামাত; তেমনি অপরদিকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তাঁরা প্রত্যেকেই খোদার মনোনীত বান্দা এবং খোদা আছেন তাঁদের প্রত্যেকের সাথে। মানুষ তখন তাঁর প্রতি ঈমান আনে, ঈমান আনে তাঁর একমাত্র খোদার প্রতি, এবং পরিহার করে পৌত্তলিকতা বা অন্য খোদার উপাসনা এবং এরই ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠিত হয় বান্দার হৃদয়ে খোদার অস্তিত্ব এবং একত্ব বা তওহীদ। বলা বাহুল্য, এই তওহীদ প্রতিষ্ঠাই নবীগণের সর্বপ্রধান কাজ। কিন্তু, এই বিষয়গুলির কোনটাই সপ্রমাণিত হয় না, যদি মনে করা হয় যে, ঈসা (আঃ) কতল হয়ে বা ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন, কিংবা তিনি সবার অলক্ষ্যে আসমানে উন্নীত

হয়েছেন। ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে মারা গেলে প্রমাণিত হয় যে, তিনি ভন্ড ও মিথ্যাবাদী এবং অভিশপ্ত ছিলেন। পক্ষান্তরে, তাঁকে বহাল তবিয়তে আকাশে উঠায়ে নেয়া হলে প্রমাণিত হয় যে, তিনি নিজে কোন অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন নি, যেমন উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন পূর্ববর্তী নবীগণের প্রত্যেকেই। অতএব, হয় তিনি নবী ছিলেন না, নয়তো নবীগণের চাইতে বড় ছিলেন। অর্থাৎ খোদার পুত্র ছিলেন। কেননা, আপনার পুত্র স্নেহ ও মমতার বশে খোদা স্বীয় পুত্রকে ক্রুশীয় যন্ত্রণার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য অলক্ষ্যে আকাশে তুলে নিয়েছেন। অথচ, অন্য কোনও নবীর ক্ষেত্রে খোদা অনুরূপ কোন স্নেহ মমতা প্রদর্শন করেননি। এমনকি হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর ক্ষেত্রেও নয়।

ধরুন, আপনাকে প্রশ্ন করা হলো-

১। প্লাবনের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ্ কি নূহ (আঃ)-কে আসমানে উঠায়ে নিয়েছিলেন ?

উত্তরে আপনি বলবেন - না, উঠায়ে নেননি।

২। নমরুদের অগ্নিকুন্ড থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ্ কি ইব্রাহীম (আঃ)-কে আকাশে তুলে নিয়েছিলেন ?

আপনি বলবেন, না, তুলে নেননি।

৩। আল্লাহ্ কি ইউসুফ (আঃ)-কে তাঁর ভাইদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আকাশে উঠায়ে নিয়েছিলেন ?

উত্তর হবে, না।

৪। আল্লাহ্ কি মূসা (আঃ)-কে ফেরাউনের যুলুম থেকে বাঁচানোর জন্য আকাশে উঠায়ে নিয়েছিলেন ?

না। নেননি।

৫। আল্লাহ কি ইউনুস (আঃ)-কে ভীষণ সেই মাছের গ্রাস থেকে বাঁচানোর জন্য আকাশে উঠায়ে নিয়েছিলেন ?

না।

৬। হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে কাফেররা যখন তাঁর ঘর ঘেরাও করে রেখেছিল, তখন কি আল্লাহ্ তাঁকে বাঁচানোর জন্য আকাশে তুলে নিয়েছিলেন ?

না।

সওর গিরি গুহা থেকে তাঁকে ও হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে কি আকাশে উঠায়ে নেওয়া হয়েছিল?

না।

সোরাকার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য তাঁদের উভয়কে কি আকাশে উঠায়ে নেয়া হয়েছিল ?

না।

আঁ হযরত (সাঃ) যখন ওহোদের যুদ্ধে কাফেরদের মারাত্মক আক্রমণে ক্ষত-বিক্ষত দেহে বেহুঁশ অবস্থায় সাহাবীদের লাশের নীচে পড়েছিলেন, তখনও কি তাঁকে আল্লাহ্ আকাশে উঠায়ে নিয়েছিলেন ?

না, নেন নি।

তাহলে, এখন বলুন, পাদ্রী তো একথা বলবেই যে, সকল নবী রসূলের চাইতে যীশু ছিলেন খোদার কাছে অধিকতর প্রিয়পাত্র। কারণ তোমরাই বল যে, যীশুকে খোদা ক্রুশের যন্ত্রণা থেকে বাঁচানোর জন্য আকাশে উঠিয়ে রেখে দিয়েছেন। পাদ্রী একথাও বলবে এবং বলেও যে, যীশু আজও বেঁচে আছেন অথচ দু'হাজার বছর ধরে কোন মানুষে বাঁচতে পারে না। কিন্তু যীশু বেঁচে আছেন, কেননা, তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী। পাদ্রী আরও বলবে এবং বলেও, তোমরাই তো বিশ্বাস কর যে, যীশু মাটি দিয়ে পাখী বানায়ে আকাশে উড়িয়ে দিতেন আর ওরাও উড়ে যেতো, তোমরাই তো বল যে, যীশু মোর্দাকে জিন্দা করতে পারতেন। মৃতকে জীবন দান করতে পারে তো একমাত্র খোদাই। অতএব, যীশুও একজন খোদা, খোদার পুত্র, পুত্র-খোদা ..... ইত্যাদি।

কিন্তু আমরা জানি যে, পাদ্রীদের ঐ সমস্ত কথাই মিথ্যা এবং সত্য এটাই যে,আল্লাহ্ এক, অদ্বিতীয়। তিনি জন্ম নেননি, কাউকে জন্ম দেনও নি। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। খৃষ্টানদের ঐ তথাকথিত মিথ্যা খোদা-পুত্রত্বের আকিদাকে অত্যন্ত শক্ত ও জোরালো ভাষায় খন্ডণ করা হয়েছে কোরআন করীমে, বলা হয়েছে ঃ

وَّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۝ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِاٰبَآئِهِمْ

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ۚ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا ۝

"এবং যেন ইহা (কোরআন) ঐ সকল লোককে সতর্ক করে, যাহারা বলে 'আল্লাহ এক পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

'এই বিষয়ে তাহাদের কোন জ্ঞান নাই এবং তাহাদের পিতৃ-পুরুষদেরও ছিল না। ইহা অত্যন্ত জঘন্য কথা যাহা তাহাদের মুখ হইতে নিঃসৃত হইতেছে। তাহারা কেবল মিথ্যা বলিতেছে"। (১৮ ঃ ৫,৬)।

এবং সূরা মরিয়মে বলা হয়েছে ঃ

تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَ تَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۝٩١ اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ۝٩٢

"আকাশসমূহ ফাটিয়া যাইবার ও পৃথিবী বিদীর্ণ হইবার এবং পর্বতমালা খন্ডবিখন্ড হইয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। কারণ তাহারা রহমান আল্লাহ্‌র প্রতি পুত্র আরোপ করিয়াছে"। (১৯ঃ ৯১ - ৯২)।

অতএব, খৃষ্টানদের সকল কথাই মিথ্যা, জঘন্য মিথ্যা। এবং ইহুদীদেরও ঐ সব বিশ্বাস যে ঈসা (আঃ) ক্রুশে অভিশপ্ত মৃত্যু বরণ করেছেন, মিথ্যা, নিকৃষ্টতম মিথ্যা। পক্ষান্তরে প্রকৃত সত্য এই যে, ঈসা (আঃ)-কে ক্রুশে লটকানো হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তিনি ক্রুশে মারা যান নি। ক্রুশে বিদ্ধ হওয়ার যন্ত্রণাও তিনি ভোগ করেছিলেন। যন্ত্রণা লাঘবের জন্য তাঁর অনুসারীরা তাঁকে যে পানীয় পান করিয়েছিলেন তাতে তাঁকে বেঁহুশ করার মত কিছু ঔষধও মেশানো হয়েছিল। ফলে, তিনি সম্পূর্ণরূপেই বেহুঁশ হয়ে পড়েন। এবং তাঁকে সেই বেহুঁশ অবস্থায় ক্রুশ থেকে নামানো হয় এবং মৃত মনে করে দাফন করা হয় ইসরাঈলী নিয়মানুযায়ী প্রশস্ত একটা পাহাড়ী কবরে। সেখানে তাঁর কিছু অনুসারী চুপিসারে তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করেন তিন দিন যাবৎ এবং তিনি কিছুটা সুস্থ হয়ে সেখান থেকে মালির ছদ্মবেশে বের হয়ে আসেন। কবর হতে বের হয়ে তিনি গলীল নামক স্থানে চলে যান যেখানে কয়েক জন হাওয়ারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তাদেরকে নিজ হাত ও পায়ের জখম দেখান। তাদের সঙ্গে মাছ ও মধু আহার করেন (মার্ক ১৬ঃ১৪, লুক ২৪ঃ৩৯-৪২)। তিনি ছদ্মবেশে বের হয়ে এসেছিলেন, নইলে ইহুদীরা ধরে আবার তাঁকে ক্রুশে লটকাতো। পরে তিনি সিরিয়া সীমান্তের গোলান পাহাড় অতিক্রম করে ইরান, আফগানিস্থান হয়ে হিন্দুস্থানে আসেন। কারণ বনী ইসরাঈলের বাকী দশটি গোত্র তখন এই অঞ্চলেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করতো। এইসব

হারানো মেষ উদ্ধারের জন্য তাঁর এতদঞ্চলে আগমন। সব নৃতাত্ত্বিকরা একমত যে, এখনও এই অঞ্চলের, বিশেষতঃ কাশ্মীরের অধিবাসীদেরকে দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এরা বনী ইসরাঈল বংশোদ্ভূত লোক।

সুতরাং ক্রুশের বিপদ থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ্ ঈসা (আঃ)-কে আকাশে উঠিয়ে নেন নি। অন্যান্য নবীদের মতই এই পৃথিবীতেই তাঁকে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলেন। এবং সেই বিপদের পর ঝর্ণা প্রবাহিত শ্যামল সুশোভিত এবং স্বর্গসম সুন্দর উপত্যকাতে অর্থাৎ ভূস্বর্গ কাশ্মীরে তাঁকে আশ্রয় দান করেছিলেন। যেমন আল্লাহ্ বলেছেনঃ

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿٥١﴾

"এবং মরিয়মের পুত্র ও তাহার মাকে আমরা এক নিদর্শন করিয়াছিলাম, এবং আমরা তাহাদের উভয়কে উপত্যকার এক উচ্চ ভূমিতে আশ্রয় দিয়াছিলাম যাহা বসবাসের যোগ্য এবং ঝর্ণা শোভিত ছিল"। (২৩ঃ৫১)

অতএব, আকাশে নয়, স্বর্গে নয়, বরং ভূস্বর্গ কাশ্মীরেই উঠেছিলেন ঈসা (আঃ) এবং অত্রাঞ্চলে বসবাসকারী সে সময়ের ইসরাঈলী গোত্রগুলোর মধ্যে তাঁর ধর্ম প্রচার করেছিলেন তিনি। অতঃপর তাঁর প্রতি আরোপিত নবুওয়তের দায়িত্ব পালন সমাপ্ত হলে খোদা তাঁকে ওফাৎ দেন এবং শ্রীনগরের খান ইয়ার মহল্লায় তিনি সমাধিস্থ হন। (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১২০ (একশত বিশ) বছর।

(চার)

হযরত ঈসা (আঃ)-এর ঈশ্বর পুত্রত্ব তথা ঈশ্বরত্ব বা উলুহিয়্যৎ প্রমাণ করার জন্য পাদ্রীরা কোরআন মজীদের একটি আয়াত পেশ করে এবং বলে যে, এই আয়াতে বলা আছে যে, আল্লাহ্ ম্যারী বা মরিয়মের মধ্যে তাঁর নিজের রূহ ফুৎকার করে দিয়েছিলেন এবং তার ফলেই হযরত মরিয়মের গর্ভ সঞ্চার হয়েছিল এবং ঈসা (আঃ) জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। আয়াতটি হচ্ছে এই ঃ

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٢﴾

"এবং সেই মহিলাকেও (স্মরণ কর) যে তাহার সতীত্বের হেফাযত করিয়াছিল, সুতরাং আমরা তাহার মধ্যে আমাদের রূহ্ হইতে ফুৎকার করিলাম এবং আমরা তাহাকে এবং তাহার পুত্রকে বিশ্ববাসীর জন্য এক নিদর্শন করিলাম"। (২১:৯২)

এই আয়াতে যে বলা হয়েছে, আমরা মরিয়মের মধ্যে আমাদের রূহ্ থেকে ফুঁকে দিলাম-এথেকেই পাদ্রীরা বলে যে, ফুঁকে দেয়া এই রূহ বা আত্মা হচ্ছে আল্লাহ্‌র রূহ এবং তা থেকেই জন্ম হয়েছে ঈসা (আঃ)-এর এবং সেজন্যই তাঁকে তোমরা মুসলমানেরাই বল যে, ঈসা রূহুল্লাহ্ - ঈসা আল্লাহ্‌র আত্মা। অতএব, ঈসার মধ্যে ঈশ্বরত্ব আছে, এবং সে কারণেই তিনি সকল মানুষের উর্ধে ও সকল মানুষের চাইতে বড়, তা সেই মানুষ নবী-রসূল, যাই হোন না কেন! ঈসা (আঃ) সকল মানুষের উর্ধে এক মহামহীয়ান মানবাতীত সত্তা এবং সে কারণেই তিনি মানুষের উপাস্য। পাদ্রীদের ইত্যাকার যুক্তিসমূহের মুখে টিকতে না পেরে ব্রিটীশ ভারতের বহুসংখ্যক মুসলমান এবং অনেক বড় বড় আলেমও খৃষ্টান হয়েছিল। এবং এখনও হচ্ছে এই উপমহাদেশের বহু এলাকায়।

কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে, এই আয়াতে উল্লেখিত 'রূহ্' শব্দটির অর্থ 'আত্মা' নয়,- এক্ষেত্রে 'রূহ্' এর অর্থ আল্লাহ্‌র বাণী বা আদেশ। 'রূহ্' শব্দটির অর্থ একাধিক, যেমন, আত্মা, ওহী বা ঐশীবাণী ও প্রেরণা, কোরআন, ফেরেশ্‌তা, সুখ, আনন্দ ও করুণা (লেইন)। অতএব, উক্ত আয়াতে মরিয়মের মধ্যে আল্লাহ্‌র রূহ থেকে ফুঁকে দেয়ার অর্থ হচ্ছে মরিয়মের মধ্যে আল্লাহ্‌র 'আদেশ-বাণী' ফুৎকার করে দেয়া। এক্ষেত্রে 'আমাদের রূহ্ থেকে' অর্থ যে আসলে 'আমাদের বাণী' থেকে তা আরও পরিষ্কার হবে নিম্নোক্ত আয়াতের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে ঃ

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا
وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ

"এবং ইমরানের কন্যা মরিয়মকে (উপমা স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন), যে স্বীয় সতীত্বকে রক্ষা করিয়াছিল এবং আমরা তাহার মধ্যে আমাদের রূহ্ ফুৎকার করিলাম এবং সে সত্যায়ন করিয়াছিল তাহার প্রতিপালকের বাণীসমূহের এবং তাঁহার কেতাবসমূহের এবং সে অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত ছিল" (৬৬:১৩)।

এই আয়াতের 'তাহার মধ্যে আমাদের রূহ্ ফুৎকার করিলাম' অংশে 'তাহার' পদটি মরিয়ম-এর সর্বনাম। কিন্তু লক্ষ্য করুন 'তাহার' পদটি এখানে স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়নি হয়েছে পুংলিঙ্গে। অর্থৎ 'ফিহা' ব্যবহৃত হয়নি, হয়েছে 'ফিহে'। এর কারণ কি ? কারণ হচ্ছে - মরিয়মকে এখানে (এবং পূর্ববর্তী আয়াতে ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়াকে) মুমিনদের উপমাস্বরূপ উপস্থাপিত করা হয়েছে। অন্য কথায়, যে সকল মুমিন তাদের মধ্যে পাপ প্রবেশের সকল দরজা বন্ধ করে দিয়ে আল্লাহ্‌র নিকটে আশ্রয় গ্রহণ করে, আল্লাহ্ তাদের প্রত্যেকের মধ্যে তাঁর রূহ্ থেকে ফুৎকার করে দেন, অর্থাৎ তার উপরে ওহী ইলহাম করেন। সুতরাং শুধু মরিয়ম কেন, আল্লাহ্ প্রকৃত পুণ্যাত্মা মুমিনদের প্রত্যেকের মধ্যেই তাঁর রূহ্ ফুৎকার করে দেন। অতএব, মরিয়মের মধ্যে রূহ্ ফুৎকার করে দেয়া হয়েছে বিধায় মরিয়মের গর্ভসঞ্চার হওয়া এবং ঈসা (আঃ)-এর জন্ম হওয়া এবং সে কারণেই ঈসা (আঃ)-এর উপরে ঈশ্বরত্ব আরোপের যে সকল দাবী খৃষ্টান পাদ্রীরা করে থাকেন তা সাকল্যই অজ্ঞতাপূর্ণ কিংবা ধোকাবাজি। অতএব, তা সমস্তই মিথ্যা- প্রকাশ্য মিথ্যা। এ প্রসঙ্গে আমরা আরও একটি আয়াতের উল্লেখ করতে চাই ঃ

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ۝٣٠

"অতঃপর, যখন আমি তাহার গঠনকার্য সুসম্পন্ন করি, এবং তাহার মধ্যে আমার রূহ্ হইতে ফুৎকার করি, তখন তোমরা তাহার (আনুগত্যের) জন্য সিজদায় পড়িয়া যাও"। (১৫ঃ৩০)

এই আয়াতেও আল্লাহ্ মানুষ বা আদমের মধ্যে তাঁর রূহ্ ফুৎকার করে দেয়ার কথা বলেছেন। লক্ষ্যণীয় যে, এই আয়াতের প্রসঙ্গ যে আদম (আঃ) তাঁকে এখানে (পূর্ববর্তী আয়াতে) আদম না বলে 'বাশার' বা মানুষ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এথেকে বলা যায় যে, আল্লাহ্ প্রতিটি মানুষের মধ্যেই তিনি চাইলে তাঁর রূহ্ থেকে ফুৎকার করে দেন। সুতরাং খৃষ্টানদের যে দাবী মরিয়মের মধ্যে আল্লাহ্ তাঁর 'রূহ' ফুকে দিয়েছেন অর্থ আল্লাহ্ তাঁর 'আত্মা' ফুঁকে দিয়েছেন - তা সম্পূর্ণ অসার ও অসত্য। রূহ্ অর্থ এখানে আল্লাহ্‌র 'বাণী'- এজন্যই কোরআন করীমে ঈসা (আঃ)-কে বলা হয়েছে কলেমাতুল্লাহ্ - 'আল্লাহ্‌র বাক্য'। এক কথায় 'রূহ্' অর্থ এক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র বাণী, আল্লাহ্‌র আদেশ।

প্রিয় পাঠক! এখানে,-'ফিহা' এবং 'ফিহে'- বিষয়টির উপরে একটু গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন, দেখতে পাবেন, কত সুক্ষ্মভাবে, কত ধূর্ত মিথ্যাচারিতা করে খৃষ্টান-পাদ্রী তথা দাজ্জাল ঈমান লুট করছে মুমিনের।

(পাঁচ)

আল্লাহ্তা'লা কোরআন করীমে বলেছেন ঃ

يٰعِيْسٰٓى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ

"হে ঈসা! নিশ্চয় আমি তোমাকে ওফাৎ দিব এবং তোমাকে উন্নীত করিব আমার দিকে" (৩ঃ৫৬)। এবং সূরা মায়েদার শেষাংশে আছে ঈসা (আঃ) কেয়ামতের দিনে আল্লাহ্‌র এক প্রশ্নের জবাবে বলবেন ঃ

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ "কিন্তু যখন তুমি আমাকে ওফাৎ দিলে"-এবং এই 'যখন'-সময়কালটা হচ্ছে তাঁর (আঃ) অনুসারীদের পথভ্রষ্ট হয়ে যাওয়ার পূর্বের সময়। অর্থাৎ, খৃষ্টানরা যখন তাঁকে খোদার পুত্র খোদা বানিয়ে তাঁর উপাসনা শুরু করে দিয়েছিল তার পূর্বেই তাঁর ওফাৎ হয়েছিল। তাই, কেয়ামতের দিনে এ সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে তিনি বলবেন ঃ

وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ۗ
وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ﴿١١٨﴾

"আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম, আমি তাদের উপর সাক্ষী ছিলাম, কিন্তু যখন তুমি আমাকে ওফাৎ দিলে, তখন তুমিই তাদের উপরে তত্ত্বাবধায়ক ছিলে এবং তুমিই সকল কিছুর উপরে সাক্ষী"। (দ্রঃ ৫ঃ ১১৭, ১১৮)।

'মোদ্দা কথা, খৃষ্টানদের পথভ্রষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্কে কেয়ামতের দিনে এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তাঁকে অবহিত না করা পর্যন্ত ঈসা (আঃ) তাঁর অনুসারীদের পথভ্রষ্টতা সম্পর্কে কিছুই জানবেন না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ঈসা (আঃ) যদি পুনরায় পৃথিবীতে আসেন, তাহলে কি তিনি দেখতে পাবেন না যে, খৃষ্টানরা তাঁকে খোদার পুত্র বানিয়ে তাঁর পূজা করছে ? শির্ক করছে ? অবশ্যই দেখতে পাবেন। এবং পৃথিবীতে পুনরায় এসে খৃষ্টানদের এই অধঃপতিত অবস্থা দেখে তাঁর পক্ষে খোদার কাছে একথা বলা কি সম্ভব হবে যে, তিনি

এসব ব্যপারে কিছুই জানতেন না? সম্ভব হবে না। কাজেই, এক্ষেত্রে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত এটাই হবে যে, ঈসা (আঃ)-এর ওফাতের পরেই খৃষ্টানরা শির্কে লিপ্ত হয়েছে, ধর্মচ্যুত হয়েছে। আর যদি মনে করা হয় যে, ওফাৎ অর্থ সশরীরে আকাশে উঠিয়ে নেওয়া, তাহলেও ঈসা (আঃ)-এর পুনরায় পৃথিবীতে নেমে আসা হবে না, বরং তাঁকে আকাশেই থাকতে হবে কেয়ামত পর্যন্ত। কেননা, তিনি পৃথিবীতে আসলেই দেখতে পাবেন যে, খৃষ্টানরা তাঁকে খোদার পুত্র বানিয়েছে। অতএব, ওফাৎ অর্থ মৃত্যু হলে তো তাঁর পক্ষে পুনরায় পৃথিবীর বুকে ফিরে আসার প্রশ্নই উঠে না; আর যদি 'ওফাৎ' অর্থ 'জীবিত অবস্থায় আকাশে উঠিয়ে নেওয়া' হয়, তাহলেও ঐ আয়াতগুলি দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, তিনি আর পৃথিবীতে ফিরে আসবেন না। কেননা, ফিরে এলে তিনি দেখতে পাবেন যে, খৃষ্টানরা তাঁর নামে খৃষ্ট-বিরোধী কাজে অর্থাৎ দাজ্জালিয়াতের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে আছে। সেক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য হতে পারতো - 'হে আল্লাহ্! প্রথমে তো আমি এসব কিছুই জানতাম না, কিন্তু আমার ওফাতের পর পুনরায় আমি যখন পৃথিবীতে গিয়েছিলাম, তখন দেখেছিলাম যে, তারা তোমাকে বাদ দিয়ে আমারই উপাসনা শুরু করেছে। কিন্তু তিনি এ ধরনের কোন কথাই বলবেন না, বরং এসব কিছু না জানার কথাই বলবেন। অতএব, ঐ ওফাতের পর ঈসা (আঃ)-এর পৃথিবীতে আর ফিরে আসার কোন সুযোগও নেই, অবকাশও নেই।

উল্লিখিত আয়াতসমূহে 'মউত' বা অপর কোনও শব্দ ব্যবহার না করে আল্লাহ্তা'লা যে 'ওফাৎ' শব্দ ব্যবহার করেছেন, তার একটা গূঢ় তাৎপর্য রয়েছে।

'ওফাৎ' অর্থ স্বাভাবিক মৃত্যু। ইহুদীদের দাবী ছিল যে, তাঁরা ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করেছে। এবং তাদের কেতাব মোতাবেক তারা বিশ্বাস করে যে, যে ব্যক্তি নবুওয়তের মিথ্যা দাবীদার হয়, হয় সে কতল (নিহত) হয়ে যায়, নয়ত সে ক্রুশে মারা গিয়ে লানতী বা অভিশপ্ত হয়। এবং এইরূপ ব্যক্তির আত্মা মৃত্যুর পরে আল্লাহ্র দিকে উন্নীত হয় না, উর্ধ্বগতি লাভ করে না, বরং অধোগতি প্রাপ্ত হয়। কাজেই, ইহুদীদের দাবীর তাৎপর্য এটাই ছিল যে, ঈসা ইব্নে মরিয়ম যেহেতু নিহত হয়েছেন বা অভিশপ্ত মৃত্যু বরণ করেছেন, সেহেতু তাঁর আত্মা আল্লাহ্র দিকে উন্নীত হয়নি– 'রাফা' লাভ করেনি। ইহুদীদের এই সব দাবীকেই মিথ্যা প্রমাণিত করে দিয়েছেন আল্লাহ্তা'লা এই কথা বলে ঃ بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ

'বরং তাকে রাফা দিয়েছেন আল্লাহ্ তাঁর দিকে' (৪ঃ১৫৯)।

এই কথার দ্বারা একদিকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ঈসা (আঃ) না নিহত হয়েছেন, না ক্রুশে মারা গেছেন, বরং তিনি স্বাভাবিক ভাবেই মারা গেছেন এবং তাঁর আত্মার 'রাফা' হয়েছে আল্লাহ্‌র দিকে। কেননা, মানুষের আত্মার রাফা হয় তার মৃত্যুর পরে। জীবিত অবস্থায় সশরীরে আসমানে চলে যাওয়া বা উঠিয়ে নেয়াকে 'রাফা' বলে না। যেমন, আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ

'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার আল্লাহ্ তাদেরকে 'রাফা' দান করেন' (৫৮ঃ১২)।

বলাই বাহুল্য, মুমিনদের এই রাফা হয় তাদের আত্মার উর্ধ্ব গমনের মাধ্যমে, এবং তা মৃত্যুর পরেই। সে কারণেই ঈসা (আঃ)-কে জীবিত অবস্থায় সশরীরে আসমানে উঠিয়ে নেয়ার কথা না আছে কোরআন করীমে, না হাদীস শরীফে, - এমন কি কোনও যয়ীফ বা দুর্বল হাদীসেও নেই। অদ্যাবধি,কেউই দেখাতে পারেন নি, পারবেনও না। কথাটা আমরা জেনেশুনেই বলছি।

যারা বলতে চান যে, 'ওফাৎ' অর্থ আকাশে উঠিয়ে নেয়া, তাঁরা এটা খেয়াল করেন না যে, আল্লাহ্ তো বলেছেন- 'আমি তোমাকে ওফাৎ দিব এবং রাফা দিব'। এখানে 'ওফাৎ' অর্থ যদি আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়, তাহলে ঐ কথার অর্থ হবে 'আমি তোমাকে আকাশে উঠিয়ে নিব এবং সশরীরে জীবিত অবস্থায় আকাশে উঠিয়ে নিব'। সেক্ষেত্রে এই বাক্যটি হবে একটি ত্রুটিপূর্ণ ও দ্বিরুক্তিবাচক (Totology) বাক্য, কিন্তু আল্লাহ্‌র কথায় কোনও ত্রুটি থাকে না, দ্বিরুক্তি থাকে না। আল্লাহ্‌র তো কোন ভাবেই কোন ত্রুটি নেই। অতএব আল্লাহ্‌র ঐ কথার অর্থ এটাই যে, হে ঈসা আমি তোমাকে স্বাভাবিক মৃত্যু দিব– তুমি নিহতও হবে না, অভিশপ্ত মৃত্যুও বরণ করবে না– এবং আমি তোমার আত্মাকে আমার দিকে উন্নীত করবো। এবং ঈসা (আঃ)ও বলছেন, যখন তুমি আমাকে ওফাৎ– স্বাভাবিক মৃত্যু দিলে, তার পরের খবরাখবর তুমিই জান। এরপরও কেউ যদি বলতেই থাকেন যে, ঈসা (আঃ) অদ্যাবধি দু'জাহার বছর ধরে বেঁচেই আছেন আকাশে কোথাও, তাহলে খোদার কালাম বিরোধী সেই কথাটা বলার দায়-দায়িত্ব তাঁরই। মনে রাখা দরকার যে, ওফাৎ

দেওয়ার কর্তা যখন আল্লাহ্ হন, তখন ওফাতের অর্থ 'জান কবয' করা ছাড়া আর কিছুই হয় না।

এর পরও যদি কেউ বলেন যে, ঈসা (আঃ)-কে জীবিতই সশরীরে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, তাহলে তাকেই পবিত্র কোরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণ করতে হবে যে, ঈসা (আঃ)-কে জীবিত অবস্থায় সশরীরে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং আকাশে আজও তিনি জীবিতই আছেন, মারা যাননি এবং তাঁর নিজের জন্য তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণীও আছে যে, তিনি আকাশ থেকে সশরীরে অবতীর্ণ হবেন।

আল্লাহ্ পাক জন্ম নেননি এবং কাউকে জন্ম দেননি বা দেন না এই কথা বলার বা শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব কি ঈসা (আঃ)-এর ছিল ? –না , ছিল না।

সুতরাং যদি ধারণা করা হয় যে, ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে আবারও আগমন করবেন, তাহলে তো তাঁর সর্বপ্রধান কর্তব্য হওয়া উচিৎ তাঁর অনুসারীদের অর্থাৎ খৃষ্টানদের কাছে এই কথা বলা যে, খোদা এক-অদ্বিতীয়, খোদার কোন পুত্র সন্তান নেই; তিনি নিজে জন্ম নেননি এবং কাউকে জন্ম দেননি। বাইবেল ও কোরআন শরীফের কোথাও একথা বলা নেই যে, ঈসা (আঃ)-এর কর্তব্য হচ্ছে, খোদা-পুত্রত্বের আকিদা খন্ডন করা। এবং সেই সঙ্গে ক্রুশীয় মতবাদ মিথ্যা প্রমাণিত করা অর্থাৎ ক্রুশভঙ্গ করা। প্রচলিত খৃষ্টধর্মের এই মিথ্যে আকিদাগুলো খন্ডন করা যদি তাঁর কর্তব্যের মধ্যে না পড়ে, খোদা যদি তাঁকে সেই দায়িত্ব না দিয়ে থাকেন (এবং খোদা তা দেনও নি) তাহলে, তাঁর (আঃ) পুনরাগমনে ফায়দা কি ? বরং তিনি এই সব মিথ্যে খৃষ্টানী আকিদা সম্পর্কে কিছুই জানেন না বলেই তো বলবেন আল্লাহ্র কাছে কেয়ামতের দিনে।

অতএব, ঈসা (আঃ) মারা যাওয়ার পরেই, ত্রিত্ববাদী আকিদাগুলো প্রচারিত হয়েছে এবং এসব ভ্রান্ত বিশ্বাসগুলো মানুষের মাঝে প্রচলিত হওয়ার পরেই যখন রসূলে পাক (সাঃ)-এর আবির্ভাব ঘটেছে এই পৃথিবীতে তখন তাঁর (সাঃ) উপরেই ন্যস্ত হয়েছিল ঐ সব বিভ্রান্তিকর খৃষ্টানী আকিদাকে খন্ডন করার এবং মিথ্যা প্রমাণিত করার। এবং এই দায়িত্ব পালনে, তিনি প্রাণপণ সংগ্রাম করে গেছেন সারাটা জীবন। এ ব্যাপারে তিনি যাবতীয় প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, অবশেষে পাদ্রী পন্ডিতদের প্রতি মুবাহালা করার চ্যালেঞ্জও দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা না তাঁর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার সাহস পেয়েছে, না সত্যকে গ্রহণ করেছে। খৃষ্টানদের সত্য প্রত্যাখানের ইত্যাকার মক্কর ও মনোভাব দেখে তিনি (সাঃ) এত বেশী মানসিক কষ্ট ও দুঃখ পেতেন যে,

তাঁর কলিজা ফেটে মরার উপক্রম হতো। তাই, স্বয়ং খোদাতালা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন ঃ

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰٓ اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ۝

'অতএব, তারা যদি এই মর্যাদাপূর্ণ বাণীর উপরে ঈমান না আনে, তাহলে কি তুমি তাদের জন্য নিজের আত্মাকেই ধ্বংস করে ফেলবে' ? (১৮ঃ ৭)

কই, খোদা তো তখন এমন কথা বলেননি যে, হে মুহাম্মদ, রসূল আমার! তুমি খামাখাই অত মনোকষ্ট পাচ্ছ। ওরা তোমার কথা না মানলে, না মানুক। তুমি সবর কর। ঈসাকে যখন আমি পুনরায় পৃথিবীতে পাঠাব, তখন সে-ই বলবে ওদের কাছে ওদের মিথ্যে আকিদাগুলোর বিরুদ্ধে।

আপনি হয়তো বলবেন যে, হাদীসে যে আছে - প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ) ক্রুশভঙ্গকারী হবেন ? হ্যাঁ, অবশ্যই তিনি ক্রুশভঙ্গকারী। কিন্তু ক্রুশভঙ্গকারী এই মসীহ্ (আঃ) তো উম্মতে মুহাম্মদীয়ারই এক ব্যক্তি। তিনি তো পূর্ববর্তী বনী ইসরাঈলী মসীহ্ (আঃ) নন, বরং তিনি তাঁর দৃষ্টান্ত বা সদৃশ বা মসীল, অর্থাৎ তিনি মসীলে মসীহ্। এবং একথাই বলা আছে কোরআন মজীদে ঃ

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ ۝٥٨

"এবং যখন মসীল হিসেবে মরিয়মের পুত্রের উল্লেখ করা হয়, তো দেখ! তোমার কওম তখন এতে হৈ চৈ শুরু করে দেয়"। (৪৩ঃ ৫৮)

এবং ঠিক এই হৈ চৈ-ই শুরু হয়ে গেছে সারা মুসলিম জাহানে, যখন বলা হয়েছে যে, প্রতিশ্রুত সেই মসীলে মসীহ্-এর আগমন হয়েছে। এখনও কি একথা বলে দেওয়ার দরকার আছে যে, উম্মতের এই হৈ চৈ করাটাই প্রমাণ করে দিয়েছে যে, যিনি সদৃশ হিসাবে এসেছেন তিনি সত্য, তাঁর দাবী সত্য?

(ছয়)

আল্লাহ্‌তা'লা বহু কঠোর পরীক্ষা নিয়েছিলেন ইব্রাহীম (আঃ)-এর। তিনি (আঃ) ঐ সকল পরীক্ষায় অতি সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এর পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ্ তাঁকে মানুষের ইমাম করেছিলেন অর্থাৎ নবুওয়ত দান করেছিলেন, এবং তাঁর বংশধরগণেরও অনেককেই। কোরআন করীমে বলা আছে ঃ

وَاِذِ ابۡتَلٰۤى اِبۡرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ؕ قَالَ اِنِّىۡ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ؕ قَالَ وَمِنۡ ذُرِّيَّتِىۡ ؕ قَالَ لَا يَنَالُ عَهۡدِى الظّٰلِمِيۡنَ ﴿۱۲۵﴾

"এবং (স্মরণ কর) যখন ইব্রাহীমকে তার প্রভু কতিপয় আদেশবাণী দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন এবং সে ঐগুলি পূর্ণ করেছিল, তিনি (আল্লাহ্) বললেন, আমি নিশ্চয় তোমাকে মানবজাতির জন্য ইমাম নিযুক্ত করতে চলেছি।' সে বলল, 'আমার বংশধরগণের মধ্য হতেও'? তিনি বললেন, আমার প্রতিশ্রুতি যালেমদের উপর বর্তিবে না"। (২ঃ১২৫)।

আমরা জানি ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর সন্তান-সন্ততির জন্য অঢেল দোয়া করেছিলেন, তিনি বিশেষ করে দোয়া করেছিলেন তাঁর পুত্র ইসমাঈলের জন্য (২ঃ১২৯) এবং রসূলে পাক (সাঃ)-এর আবির্ভাবের জন্য (২ঃ১৩০) এবং আঁ হযরত (সাঃ)ও বলেছেন, 'আমি ইব্রাহীমের দোয়ার ফল'। আমরা এও জানি যে, আঁ হযরত (সাঃ) হচ্ছেন ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর।

উল্লিখিত আয়াতে ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়ার উত্তরে আল্লাহ্ যা বলেছেন তার অর্থ হচ্ছে, হ্যাঁ, আমি তোমার সন্তান-সন্ততিদের মধ্য থেকে ইমাম বা নবী বানাবো, তবে তোমার বংশধরদের মধ্য থেকে যারা যালিম বলে পরিগণিত হবে তাদেরকে আমি ইমাম বা নবী বানাব না। আল্লাহ্‌তা'লার এই প্রতিশ্রুতি মোতাবেক আমরা এও জানি যে, বনী ইসহাক তথা বনী ইসরাঈল জাতি যখন অবাধ্যতা করে, সীমালংঘন করে যালিম হয়ে গেল, তখন আল্লাহ্ তাদের মধ্যে জারিকৃত নবুওয়তের সিলসিলা বন্ধ বা কর্তন করে দিলেন ঈসা (আঃ)-এর আগমনের পর। ইহুদীরা ঈসা (আঃ)-কে ক্রুশ বিদ্ধ করে মারার চেষ্টা করলো. তাদেরকে ঈসা (আঃ)-এর জবানেই অভিশপ্ত করা হলো (৫ঃ ৭৯)। তাদের যালিম হয়ে যাওয়াকে তাদের কাছে সপ্রমাণিত করার জন্য আল্লাহ্ বিনা পিতায় জন্ম ঘটালেন ঈসা (আঃ)-এর। অর্থাৎ এই ঘটনার দ্বারা আল্লাহ্ স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিলেন যে, তোমরা বনী ইসরাঈলরা এতই নিকৃষ্ট যালিম বনে গেছ যে, তোমাদের মধ্যে নবীর পিতা হওয়ার মত কোন যোগ্য পুরুষ আর বাকী নেই। উপরন্তু, এথেকে এটাও প্রমাণিত হলো যে, বনী ইসরাঈলীদের মধ্যে জারিকৃত নবুওয়তের ধারা বা সিলসিলা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ্‌তা'লা নবুওয়তের পবিত্র সিলসিলা জারি করে দিলেন, তাদের ভাইদের মধ্যে অর্থাৎ বনী ইসমাঈলের মধ্যে (দ্বিঃ বিঃ -১৮ঃ১৮)।

কিন্তু এখন যদি বলা হয় যে, বনী ইসরাঈলের নবী ঈসা (আঃ) আজও পর্যন্ত বেঁচে আছেন, তিনি মারা যাননি, তাহলে একদিকে স্বীকার করতে হবে যে, বনী ইসরাঈলীদের মধ্যেকার নবুওয়তের সিলসিলা এখনও জারি রয়েছে। এবং বনী ইসমাঈলের মধ্যে এখনও নবুওয়তের সিলসিলা জারি হয়নি। সে কারণেই মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আগমনও এখনও ঘটেনি। অপরদিকে এও স্বীকার করতে হবে যে, বনী ইসরাঈল জাতি এখনও পর্যন্ত খোদার দৃষ্টিতে অভিশপ্ত বা মগযুব ও যালিম সাব্যস্ত হয়নি এবং সূরা ফাতেহার প্রার্থনা আমরা খামাখাই করে থাকি। কিন্তু ঐশী সত্য এবং ঐতিহাসিক সত্য তো এটাই যে, ঈসা (আঃ)-এর পরে, বনী ইসরাঈল অভিশপ্ত ও যালিম হয়ে যাওয়ার পরেই মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সর্বমঙ্গলময় আবির্ভাব ঘটে গেছে এই পৃথিবীতে সব মানুষের জন্যে।

সুতরাং আল্লাহ্‌র কথা মতে, ঈসা (আঃ)-এর স্বাভাবিক মৃত্যুর পরেই, এবং বনী ইসরাঈল যালিম ও পথভ্রষ্ট হয়ে যাওয়ার পরেই, তারা অভিশপ্ত হয়ে যাওয়ার পরেই তাদের মধ্যেকার নবুওয়তের ধারাকে চিরতরে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। অতঃপর তাদের ভাইদের মধ্য হতে আল্লাহ্‌তা'লা স্বীয় ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে প্রেরণ করেছেন এই পৃথিবীতে। আর যদি, কিছু সংখ্যক আলেমের কথা মতে ঈসা (আঃ) আজও পর্যন্ত বেঁচেই থাকেন এবং বনী ইসরাঈলের মধ্যে জারিকৃত নবুওয়তের ধারা কর্তিত না হয়ে থাকে, অব্যাহতই থাকে, তাহলে একথা না মেনে উপায় থাকবে না যে, বনী ইসরাঈলীরাই এখনও আল্লাহ্‌র পসন্দকৃত জাতি, এবং সেক্ষেত্রে খৃষ্টানদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলতে হবে যে, নাউযুবিল্লাহ্, মুহাম্মদ মিথ্যে, ইসলাম মিথ্যে। পক্ষান্তরে সত্য হচ্ছে ঈসা (আঃ)-এর বেঁচে থাকাটা এবং তাঁর (আঃ) খোদার পুত্র হওয়াটা যদ্দরুন 'আকাশসমূহ ফাটিয়া যাইবার ও পৃথিবী বিদীর্ণ হইবার এবং পর্বতমালা খন্ড বিখন্ড হইয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে (১৯ঃ ৯১-৯২)। আর যদি আপনি কোরআন মোতাবেক বিশ্বাস করেন এবং আপনি যদি চান যে, মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শিক্ষা ও সৌন্দর্যই চিরসত্য চিরজীবন্ত ও সর্বশ্রেষ্ঠ বিধায় তা বেঁচে থাক,এবং সকল ধর্মের উপরে ইসলাম বিজয় লাভ করুক, তাহলে ঈসা (আঃ) যে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু বরণ করে ইহজগত ছেড়ে পরজগতে চলে গেছেন এবং এই জগতে পুনরায় ফিরে আসবেন না, এবং বনী ইসরাঈল জাতি যে যালিম জাতিতে পরিণত হয়েছে এবং তাদের মধ্যে জারিকৃত নবুওয়তের সিলসিলা যে কর্তন করে দেয়া হয়েছে -সেই সত্যই বিশ্বাস করতে হবে। এবং প্রকৃত

সত্য তো এটাই ; এটাই তো আল্লাহ্‌র সেই অঙ্গীকার যা তিনি করেছিলেন ইব্রাহীম (আঃ)-এর সঙ্গে। আল্লাহ্‌ তাঁর সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করেননি এবং পূরণ করেছেন।

ইদানিং কেউ কেউ বলছেন যে, মারা গেলেও ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্‌ পুনরায় জীবিত করে পাঠাবেন দুনিয়াতে। এটা তাঁরা বলেন এই কারণে যে, তাঁরা দেখেন ও বুঝেন যে, কোরআন করীমে সুস্পষ্টভাবেই বলা আছে যে, ঈসা (আঃ) স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন। এক ব্যক্তি এহাঁতক বলেছেন যে, আল্লাহ্‌ যদি পুনরায় ঈসা (আঃ)-কে জীবিত করে পুনরায় এই দুনিয়াতে আবার পাঠান তাহলেও সেটা 'অসমীচীন' হবে না। এই ভদ্রলোক আসলে নিজের স্বার্থে, জিদে ও অলীক ধারণার বশে অন্ধ হয়ে গিয়ে খোদাতা'লার কাজেরও সমীচীন হওয়া না হওয়ার বিচারে বসে গেছে। অথচ, খোদা কোন মৃত ব্যক্তিকে যে জিন্দা করেন না, পুনরায় তাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন না, এই সত্যটা তারাও সবাই জানেন ও বুঝেন। কিন্তু তারা বুঝতে চান না যে, ঈসা (আঃ)-কে পুনর্জীবিত করে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠানোর যে বিশ্বাস বা আকিদা সেটা তো খৃষ্টানদেরই আকিদা। খৃষ্টানরাই তো এই আকিদাটা পোষণ করে এবং প্রচার করে যে, যীশু ক্রুশে তিনদিনের জন্য অভিশপ্ত মৃত্যুবরণ করেন, কিন্তু পুনরায় জীবিত হয়ে উঠে স্বীয় পিতার কাছে স্বর্গে চলে গেছেন এবং শেষ যুগে আবারও পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন তাঁর পিতার স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যে। খৃষ্টানরা তো বিশ্বাস করে যে, যীশু মাত্র তিন দিন মৃত অবস্থায় কবরস্থ থাকার পর পুনরায় জীবিত হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু এই লোকগুলো বিশ্বাস করে যে, ঈসা (আঃ) প্রায় দু'হাজার বছর ধরে মৃত অবস্থায় থাকার পরও পুনরায় জিন্দা হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসবেন। পাদ্রীর কি সাধ্য যে, এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারে ? 'ভূত'-এ বিশ্বাস না করলেও অন্ধকার রাতে নিধূয়া পাথারে বিশাল কোন বৃক্ষের নীচে গেলে গা ছম ছম করে 'ভূতের ভয়ে'। সমস্যাটা হচ্ছে, 'ভূত' এর কুসংস্কারটা ভাঙ্গা গেলেও 'ভূতের-ভয়' এর কুসংস্কারটা ভাঙ্গা মুশ্‌কিল।

(সাত)

আপনি হয়তো বলবেন, হাদীসে তো আছে যে, ঈসা (আঃ) মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে নাযিল হবেন এবং কোরআনী শরীয়তের তসদীক করবেন এবং এই শরীয়তের আনুগত্য করবেন এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করবেন ?

হ্যাঁ, হাদীসে অবশ্যই আছে যে, ঈসা (আঃ) এই উম্মতের মধ্যে নাযিল হবেন। কিন্তু ঐ হাদীসগুলিতে এ কথা কোথাও বলা নেই যে, বনী ইসরাইলী ঈসাই (আঃ) এই উম্মতের ঈসা (আঃ)। আঁ হযরত (সাঃ)-কোথাও এইভাবে সনাক্ত বা আইডেন্টিফাই করেন নি যে, বনী ইসরাঈলী ঈসা (আঃ) তাঁর উম্মতের ঈসা (আঃ)। বরং তিনি দুইজন আলাদা ঈসা (আঃ)-এর দুই রকম হুলিয়া বর্ণনা করে গেছেন। তাঁর বর্ণনা মতে বনী ইসরাঈলী ঈসা (আঃ)-এর মাথার চুল ছিল কোঁকড়ানো, পক্ষান্তরে তাঁর উম্মতে আগমনকারী ঈসা (আঃ)-এর মাথার চুল সোজা, সরল। এক জনের গায়ের রঙ লাল ফর্সা অপরজনের গোধূম বা গন্দম বর্ণ।

তাছাড়া আঁ হযরত (সাঃ) বলেছেন ঃ

لَوْ كَانَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى حَيَّيْنِ لَمَا وَسِعَهُمَا إِلَّا اتِّبَاعِىْ

'মূসা ও ঈসা বেঁচে থাকলে আমার আনুগত্য করা ছাড়া তাদের গত্যন্তর থাকতো না'।

সুতরাং মূসা (আঃ) যেমন মারা গেছেন, তেমনি ঈসা (আঃ)ও মারা গেছেন। আল্লাহ্ মূসাকেও (আঃ) ফেরাউনের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য আকাশে উঠিয়ে নেন নি। ঈসা (আঃ)-কেও ইহুদীদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য আকাশে উঠিয়ে নেন নি। সব চাইতে বড় কথা হচ্ছে - ঈসা (আঃ)-এর দায়িত্ব ছিল সীমিত, শুধুমাত্র বনী ইসরাঈলের জন্য। তাঁর দায়িত্ব সমস্ত মানব জাতির জন্য ছিল না 'রাসূলান ইলা বানী ইসরাঈল' অর্থাৎ আল্লাহ্‌তা'লা ঈসা (আঃ)-কে কেবল বনী ইসরাঈল জাতির নিকট রসূলরূপে প্রেরণ করেছিলেন (৩ঃ৫০)। আল্লাহ্‌তা'লা ঈসা (আঃ)-কে বনী ইসরাঈল ছাড়া অন্য আর কোনও জাতির জন্য প্রেরণ করেন নি। অন্য জাতির কাছে খোদার বাণী পৌঁছানোর দায়িত্ব ও এখতিয়ার কোনটাই তাঁর ছিল না। বাইবেলেও এ কথাই বলা আছে।

এখন যদি মনে করা হয় যে, বনী ইসরাঈলী নবী ঈসা (আঃ) আবারও পৃথিবীতে নাযিল হবেন এবং তিনি বনী ইসমাঈল তথা উম্মতে মুসলেমার সংশোধনের কাজ করবেন, ইসলামের খেদমত করবেন, তাহলে কথাটার অর্থ এই দাঁড়াবে যে, ঈসা (আঃ) তাঁর প্রতি আল্লাহ্ কর্তৃক আরোপিত দায়িত্বের সীমা লংঘন করবেন এবং খোদার দৃষ্টিতে সীমা লংঘনকারী সাব্যস্ত হবেন। অথচ জীবদ্দশায়ও তিনি সেই সীমা লংঘন করেন নি। কোন নবীই এরূপ

কখনও করেন না। এবং অপরদিকে যদি মনে করা হয় যে, স্বয়ং রসূলে পাক (সাঃ) বনী ইসরাঈলী নবী ঈসা (আঃ)-কে তাঁর উম্মতের সংশোধনের এবং তাঁর ধর্ম ইসলামের খেদমতের জন্য দায়িত্ব অর্পণ করে গেছেন, তাহলে এই ধারণাটার অর্থ এই হবে যে, তিনি (সাঃ) আল্লাহ্ প্রদত্ত দায়িত্বের সীমা লংঘন করে ঈসা (আঃ)-কে অনেক বড় দায়িত্ব অর্পণ করে গেছেন। এতে কি স্বয়ং রসূলে পাক (সাঃ)ও (নাউযুবিল্লাহ) সীমা লংঘকারী বলে সাব্যস্ত হবেন না ? সুতরাং আসল কথা হচ্ছে, আঁ হযরত (সাঃ) তাঁর উম্মতের মধ্যে যে ঈসা ইব্‌নে মরিয়ম (আঃ)-এর নাযিল হওয়ার শুভ সংবাদ দিয়ে গেছেন, তিনি এই উম্মতেরই এক ব্যক্তি, তাঁর (সাঃ) উম্মতের বাইরের নন ঃ

كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ -

(بخاری باب نزول عیسیٰ)

'কেমন (সুন্দর) যে হবে তোমাদের অবস্থা যখন তোমাদের মধ্যে ইবনে মরিয়ম নাযিল হবে এবং তোমাদের ইমাম হবে তোমাদের মধ্য থেকেই।'

অর্থাৎ ঈসা ইবনে মরিয়ম তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের ইমাম হবেন।

ঈসা (আঃ) ছিলেন তো কেবল মাত্র বনী ইসরাঈলের নবী, কিন্তু আমরা বনী ইসমাঈলরা তাঁরই প্রতীক্ষায় দিন গুণছি কোন আক্কেলে ?

তারা এই বিষয়টিও বুঝতে চান না যে, ঈসা (আঃ) তো ছিলেন তওরাতের তসদীককারী ও সেই শরীয়তের আনুগত্যকারী নবী। তিনি তো কোরআন জানতেন না এবং কোরআনী শরীয়ত পালন করাও তাঁর জন্য বাধ্যকর ছিল না। তিনি কী করে কোরআন ও কোরআনী শরীয়তের অনুবর্তিতা করবেন এবং ইসলামের খেদমত করবেন ? যদি বলা হয় যে, তিনি তখন কোরআন শিখে নিবেন, তারপর ইসলামী শরীয়ত পালন করবেন। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠবে, তিনি কার কাছে কোরআন শিখবেন ? তিনি তো নবী। নবী হয়ে তিনি অন্য লোকের কাছে কী করে আল্লাহ্‌র কিতাব শিখবেন ? সেক্ষেত্রে তো তিনি নিজেই নবুওয়তের মর্যাদার অবমাননা করবেন। তাছাড়া কোরআন শিক্ষা করার পূর্বে তাঁকে তো বাকায়দা ইসলাম গ্রহণ করতে হবে। তিনি বয়াত করবেন কার হাতে ? তিনি তো নবী। সুতরাং একমাত্র মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর হাতেই তাঁর পক্ষে বয়াত করা সম্ভব। কিন্তু রসূলে পাক (সাঃ) ইন্তেকাল করে গেছেন।

আসলে ঈসা (আঃ)-এর অদ্যাবধি বেঁচে থাকার ধারণাটা একটা সম্পূর্ণ অলীক ধারণা। এই অলীক ধারণাটা ইসলামী সাহিত্যে অনুপ্রবিষ্ট করে দিয়েছে খৃষ্টান পাদ্রী ও পন্ডিতরাই। অতঃপর এই অসত্য ধারণাটাকে সম্ভাব্য করার স্বপক্ষে নানাজনে নানা প্রকারে রঙ চড়ানোর নানা কল্পনা করে চলেছে, এবং বলাই বাহুল্য এসবই আজগুবী কল্পনা, সত্যের সঙ্গে এগুলোর লেশমাত্র সংশ্রব নেই।

(আট)

আর একটা প্রণিধানযোগ্য বিষয় হচ্ছে - আমরা জানি, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সঙ্গে আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, বনী ইসরাঈল যালিম ও অভিশপ্ত হয়ে গেলে পর, তাদের মধ্যেকার নবুওয়তের সিলসিলাকে সরিয়ে নিয়ে তা বনী ইসমাঈলের মধ্যে জারি করা হবে। হয়েছেও তাই।

এখন ধরা যাক, ঈসা (আঃ) বেঁচেই আছেন, এবং যেহেতু আল্লাহ্‌ কখনও কোন নবীর নবুওয়ত বাজেয়াপ্ত করে নেন না (অবশ্য, নবুওয়ত তেমন কোন জিনিষই নয়) সেহেতু, ঈসা (আঃ)-এর নবুওয়তও বাজেয়াপ্ত করা হয়নি, হবেও না। কাজেই এখনও তিনি নবীই আছেন, তা তিনি ইহজগতের যেখানেই থাকুন না কেন। তাহলে অবস্থাটা দাঁড়াবে এরকম ঃ দুনিয়াতে বনী ইসরাঈলী নবী ও নবুওয়তের সিলসিলা এখনও জারি আছে। পক্ষান্তরে, বনী ইসমাঈলী নবী ও নবুওয়তের সিলসিলা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ওফাতের পর শেষ হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে খৃষ্টান পাদ্রী সঙ্গত কারণেই দাবী করতে পারবে যে, বনী ইসমাঈল জাতিই অভিশপ্ত ও যালিম। কেননা, তাদের মধ্যে নবীর আগমন ও নবুওয়তের ধারা জারি করা হলেও এখন তা শেষ হয়ে গেছে। অপরদিকে, বনী ইসরাঈল জাতিই হচ্ছে নেয়ামত প্রাপ্ত জাতি, কেননা ঈসা এখনও জীবিত থাকার কারণে তাদের মধ্যে নবী ও নবুওয়তের ধারা তথা ঐশী আশীর্বাদের ধারা এখনও জারি আছে, অব্যাহত আছে। পাদ্রী আরও বলবে যে, যেহেতু মুহাম্মদের পরে আর নবী নাই, সেহেতু বনী ইসমাঈলের মধ্যে যে নবুওয়তের ধারা জারি করা হয়েছিল সেই নবুওয়ত শেষ হয়ে গেছে। অতএব, এই ধারায় মুহাম্মদই শেষ নবী, তাঁর পরে আর নবী নাই এবং এই কথাটা তোমরা মুসলমানরাই বলে থাক। সুতরাং তোমাদের বিশ্বাস মতে, তোমাদের উচিত হবে, জিন্দা ঈসাকে মেনে নিয়ে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করা। কেননা,ঈসার ঐশী শক্তির ধারা এখনও

প্রবহমান রয়েছে। পক্ষান্তরে বনী ইসমাঈলী মুহাম্মদের মৃত্যু হয়েছে,এবং এই ধারায় তাঁর নবুওয়তই শেষ নবুওয়ত এবং তিনিই শেষ নবী। অতএব, মৃত মুহাম্মদকে বাদ দিয়ে জীবিত ঈসাকে ও তাঁর ধর্মকে গ্রহণ করাই তোমাদের কর্তব্য। কেননা, ঈসা জিন্দা, ঈসার নবুওয়ত জিন্দা এবং সেই নবুওয়তের ধারা অব্যাহত রয়েছে।

খৃষ্টান পাদ্রীর এই কথার জবাবে আপনি কি বলবেন জানি না। তবে, আমরা বলবো, না তোমাদের কথা ঠিক নয়। কেননা, বাইবেল ও কোরআনের মতে ঈসা (আঃ) মারা গেছেন এবং তাঁর মৃত্যুর পরেই মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আগমন হয়েছে। এবং তাঁর (সাঃ) নবুওয়ত যেহেতু সম্পূর্ণ ও সর্বমঙ্গলময়, সেহেতু তাঁর নবুওয়তের আধ্যাত্মিক শক্তি সার্বজনীন, সর্বকালীন এবং অফুরন্ত ও চিরবহমান। এবং চিরজীবন্ত এই চিরন্তন নবুওয়তের শক্তি ও ক্ষমতা এত বেশী প্রবল ও এত বেশী প্রভাব বিস্তারকারী যে, তা ঈসা (আঃ)-এর মত নবী তৈরী করতে সক্ষম। এবং তা করেছেও ইতোমধ্যে। এবং সেই ঈসা যাঁর আসল নাম মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)। তিনি বলেছেন ঃ

'বরতর গুমান ও ওহম ছে আহ্‌মদ (সাঃ) কি শান হ্যায়,
যেছকা গোলাম দেখো মসীহুজ্জামান হ্যায়'।
আহ্‌মদ (সাঃ)-এর মহিমা ও মর্যাদা চিন্তা ও কল্পনার অতীত;
তার এক গোলামকেই দেখো সে যামানার মসীহ্ হয়েছে।

(নয়)

হযরত রসূলে পাক (সাঃ)-এর ওফাত হয়ে গেলে, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) শোকে দুঃখে অস্থির হয়ে পড়েন। হযরত উমর (রাঃ) তো প্রায় পাগলপারা হয়ে গিয়েছিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) তখন পাক কোরআনের একটি আয়াত পাঠ করে সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন যে,রসূলে করীম (সাঃ)-এর ওফাৎ হয়ে গেছে যেমন ওফাৎ হয়ে গেছে পূর্ববর্তী সকল নবী-রসূলের। সেই আয়াতটি হচ্ছে ঃ

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ
عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ

এই আয়াতের যে তরজমা করেছেন শ্রদ্ধেস্পদ মওলানা আজীজুল হক সাহেব (শায়খুল হাদীস) আমরা তা-ই তুলে দিচ্ছি হুবহু ঃ

"মোহাম্মদ রসূল বটেন (কিন্তু তিনি- মানুষ- তিনি খোদা নন) তাঁহার পূর্বে আরও অনেক রসূল আসিয়াছিলেন যাঁহাদের কেহই দুনিয়াতে চিরজীবি হন নাই, সকলেরই মৃত্যু হইয়াছে, (মোহাম্মদ (দঃ)ও সেই একই পথের পথিক) সুতরাং মোহাম্মদ (দঃ) মরিয়া গেলে বা শহীদ হইয়া গেলে তোমরা কি (দ্বীন ইসলাম ছাড়িয়া দিয়া) পিছনের অবস্থার দিকে এবং অধঃপতনের দিকে ফিরিয়া যাইবে ? "----------

এই প্রসঙ্গে মোহতারম শায়খুল হাদীস আরও লিখেছেন ঃ

"ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, খোদার কসম, লোকজন যেন ইতোপূর্বে জানিতই না যে,এই আয়াত পবিত্র কোরআনে রহিয়াছে, আবুবকর উহা তেলাওয়াৎ করার পরেই যেন তাহারা উহা জানিতে পারিল এবং সকলেই আবুবকরের মুখ হইতে উহা গ্রহণ করিয়া নিল, এমনকি কোন একজন মানুষও আমি দেখি নাই, যে এই আয়াত তখন তেলাওয়াত করিতেছিল না"।

"ওমর (রাঃ)ও বলিয়াছেন, আবুবকরের মুখে এই আয়াত শুনার সঙ্গে সঙ্গে আমারও হাত-পা ভাঙ্গিয়া পড়িল --------আমি মূর্ছা খাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলাম"। *(বোখারী শরীফ ঃ ৫ম খন্ড, পৃঃ ২৯৫ ঃ হামিদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা)*

এই আয়াত তেলাওয়াতের মাধ্যমে হযরত আবুবকর বিষয়টি পরিষ্কার করে দিলেন যে, নবী রসূলদের কেহই দুনিয়াতে চিরজীবি হন নি, সকলেরই মৃত্যু হয়েছে, অতএব, রসূলে পাক (সাঃ)-এরও মৃত্যু হয়ে গেছে। এবং উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম সবাই নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করলেন যে, রসূল করীম (সাঃ) মারা গেছেন এবং তাঁর পূর্ববর্তী নবী-রসূলরাও মারা গেছেন। অতএব, বলাই বাহুল্য যে, আঁ-হযরত(সাঃ)-এর ঠিক পূর্ববর্তী নবী ঈসা (আঃ) অবশ্যই মারা গেছেন, বেঁচে নেই। নবী-রসূলগণের সকলের মৃত্যুর বিষয়ে সকল সাহাবীই সে দিন একমত হয়েছিলেন, এবং এটাই আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মৃত্যুর পরে সাহাবায়ে কেরামের সর্ব প্রথম ও সর্বশেষ 'ইজমা'। সুতরাং হযরত আবুবকরসহ সকল সাহাবীগণের (রাঃ) সেদিনের সেই দ্বিধা ও সংশয় অপনোদনকারী সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধা রেখে এক্ষেত্রে আমরা এ কথা বলতে বাধ্য যে, ঈসা (আঃ) মারা গেছেন। অন্যান্য সকল নবীও মারা গেছেন। তাঁদের প্রত্যেকেরই পকিত্র আত্মা উন্নীত হয়েছে, চলে

গেছে আল্লাহ্‌র দিকে- ইলায়হে। মৃত্যুর পরে প্রত্যেক মুমিনের আত্মাও উন্নীত হয়, চলে যায় আল্লাহ্‌র দিকে- ইলায়হে। (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)।

"ইয়া ঈসা ইন্নি মুতাওয়াফ্‌ফেকা ও রাফেওকা এলাইআ" 'হে ঈসা! আমি তোমাকে ওফাৎ দিব (মুতাওয়াফফেকা) এবং রাফা দিব আমার দিকে- এই আয়াতের মুতাওয়াফ্‌ফেকা শব্দের অর্থ করেছেন ইবনে আব্বাস (রাঃ) 'মুমিতোকা' তোমাকে মৃত্যু দান করবো'। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর এই অর্থ সমর্থন ও গ্রহণ করেছেন হযরত ইমাম বোখারী (রাঃ) স্বয়ং।

কেউ কেউ বলে থাকেন যে,ঈসা (আঃ) যখন পুনরায় দুনিয়াতে আসবেন তখন তিনি, নবী থাকবেন না। কিন্তু শ্রদ্ধেয় মওলানা আজীজুল হক সাহেব তা মানেন না, কোনও মুমিনের চিত্তই তা মানতে পারে না। কেননা খোদা প্রদত্ত উচ্চ মর্যদার নবীকে নামিয়ে এনে তাকে অ-নবীর অধঃস্তন আসনে বসানোর মত নিকৃষ্ট কাজ আর কী হতে পারে? মোহতারম মওলানা সাহেব লিখেছেন ঃ

'তিনি (ঈসা আঃ) ব্যক্তিগতভাবে নবী থাকিলেও তাঁহার তৎকালীন জীবন উম্মতে মোহাম্মদীর অন্তর্ভুক্ত থাকিবে'।

(প্রাগুক্তঃ বোখারী শরীফ ঃ ৫ম খন্ড, পৃ ঃ ১৬০)

আমাদের কথাও অনেকটা তা-ই বলতে পারেন। আমরাও বলি যে, আগমনকারী ঈসা (আঃ) আঁ-হযরত (সাঃ)-এর একজন উম্মতি হবেন এবং নবীও হবেন। তিনি একই সঙ্গে উম্মতিও, নবীও। এক কথায় 'উম্মতি নবী'। এবং যেহেতু তাঁকে উম্মতি হতে হবে, সেহেতু তিনি এই উম্মতের একজন হবেন, বাইরের কোনও উম্মতের লোক হবেন না। বাইরের উম্মতের কোনও নবী আঁ-হযরত (সাঃ)-এর হাতে বয়াত না করেই এই উম্মতে শামিল হতে পারবেন না। হলে তিনি অনধিকার প্রবেশকারী (Trespasser) হবেন। মুহাম্মদী নবুওয়তের পরিধি বা সীমানা লংঘনকারী হবেন। এক কথায় তিনি হবেন খাতামান্নাবীঈনের -'খাতাম' এর ভঙ্গকারী। এমনটি হলে বনী ইসরাঈলী ঈসা (আঃ) প্রথম খত্‌মে নবুওয়ত ভঙ্গকারী বলে সাব্যস্ত হবেন। সুতরাং সত্য এটাই যে, এই উম্মতের নবী এই উম্মতের মধ্য থেকেই, নবী করীম (সাঃ)-এর পরম আনুগত্যের ফলে, উম্মতি নবী হবেন। এক ব্যক্তি লিখেছেন যে, 'উম্মতি নবী' একটি খৃষ্টানী ধারণা। যীশুর 'প্রেরিত' বা (Apostle)-এর ধারণা থেকেই নাকি উম্মতি নবীর ধারণার সৃষ্টি করা হয়েছে।

কিন্তু তিনি ভুলে গেছেন যে, যীশুর ঐ লোকেরা তো যীশুকে 'নবী' মানতো না, মানতো 'ঈশ্বর-পুত্র'। অতএব, তারা উম্মতি নবী হবে কেন ? তারাতো হবে 'উম্মতি ঈশ্বর-পুত্র'। নয় কি ? তবে এই দাবীটা অদ্যাবধি কোন পাদ্রীতেও করেনি, যা কিনা ঐ লোকটি করেছেন।

হযরত ইমাম মালেক (রহঃ) ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বলেছেন যে, ঈসা (আঃ) মারা গেছেন। মাজমাউল বেহারুল আনওয়ার (১ম খন্ড, পৃঃ ২৮৬) এবং আক্মালুল আকমাল (১ম খন্ড পৃ: ২৬৫) নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলিতে বলা আছে ঃ

قَالَ مَالِكٌ مَاتَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ -

(اکمال الاکمال شرح مسلم جلد ۱ ص ۲۶۵)

অর্থাৎ ইমাম মালেক (রহঃ) বলেছেন -ঈসা ইবনে মরিয়ম মারা গেছেন।

ইমাম মালেকের এই অভিমতের বিরোধিতা করেন নি হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এবং ইমাম আহ্মদ বিন্ হাম্বল (রহঃ)। ইমাম শাফী (রহঃ)ও কোন দ্বিমত পোষণ করেন নি। অতএব, বলতেই হবে যে, এই চারি ইমামের প্রত্যেকেই ঐকমত্য পোষণ করতেন যে, ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু হয়ে গেছে। কিন্তু তাজ্জবের ব্যাপার হচ্ছে, মোহতারম শায়খুল হাদীস সাহেব এর বিরুদ্ধ মত সমর্থন করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন, 'মনে হয় ইমাম মালেক 'মাতা' শব্দ বলিয়া হযরত ঈসাকে আসমানে উঠাইয়া নেওয়াই উদ্দেশ্য করিয়াছেন'। তিনি এই কথার হাওয়ালা স্বরূপ 'মাজমাউল বেহার' গ্রন্থের ১ হইতে ২৮৬ পৃঃ পর্যন্ত নির্দেশ করেছেন। তিনি আরও লিখেছেন ঃ

"ইমাম মালেকের অভিমতের এই ব্যাখ্যাই সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা, কারণ ইহজগৎ ত্যাগ করাকে 'মাতা' বলা হয়; হযরত ঈসা যখন আসমানে চলিয়া গিয়াছেন তখন তিনি অবশ্যই ইহজগৎ ত্যাগ করিয়াছেন *(প্রাঃ বোখারী শরীফ ঃ ৫ম খন্ড, পৃঃ ১৪৮)।*

হযরত ঈসা (আঃ) ইহজগৎ ত্যাগ করিয়াছেন- এ কথার অর্থই তো তিনি (আঃ) পরজগতে গিয়েছেন। আর ইহজগৎ ত্যাগ করে পরজগতে যাওয়ার অর্থই তো মত্যু বরণ করা। অতএব, ঈসা (আঃ) মারা গেছেন, তিনি বেঁচে নেই, তিনি ইহজগতে নেই, না জমিনে, না আসমানে।

(দশ)

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক বিখ্যাত হাদীসে আছে যে, 'আল্লাহ্‌র কাছ থেকে হযরত আহ্‌মদ (সাঃ)-এর অতি উচ্চ মাকাম ও মহিমা সম্পর্কে জানতে পেরে হযরত মূসা (আঃ) প্রার্থনা করলেনঃ

'হে আল্লাহ! আমাকে সেই উম্মতের নবী বানিয়ে দাও'। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করলেনঃ 'সেই উম্মতের নবী তাদের মধ্য থেকেই হবে'।

মূসা (আঃ) পুনরায় আরজ করলেন ঃ

'তবে আমাকে সেই নবীর এক উম্মত বানিয়ে দাও।' আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করলেন:

' তুমি তাঁর পূর্বেই নবীরূপে আবির্ভূত হয়েছ। আর সেই নবী তোমার পরে প্রেরিত হবেন। তবে, জান্নাতে তাঁর সঙ্গে তোমাকে একত্রিত করে দেব'। (হুলিয়া)

(দ্রঃ নশরুত্ তীব ফি যিক্‌রিন্নাবিয়্যীন হাবিব ঃ মওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেব ঃ ঐ অনুবাদ 'যে ফুলের খুশবুতে সারা জাহান মাতোয়ারা' ঃ মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।)

এই হাদীস থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে নবীর আবির্ভাব ঘটবে, এই উম্মতের মধ্য থেকেই, বাইরে থেকে নয়। এবং এরূপ নবীই হবেন 'উম্মতি নবী'।

যাঁরা মনে করেন যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর উম্মত হওয়ার জন্য ঈসা (আঃ) দোয়া করেছিলেন, তাঁদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, অনুরূপ দোয়া ঈসা (আঃ) করেন নি, করেছিলেন মূসা (আঃ)। কিন্তু মূসা (আঃ)-এর সেই দোয়ার উত্তরে আল্লাহ্ পাক যা বলেছিলেন তাই উল্লিখিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। হয়তো মূসা (আঃ)-এর ঐ দোয়াকেই ঈসা (আঃ)-এর দোয়া বলে প্রচারিত করা হয়েছে। কিন্তু তাতে লাভ হবে না। কারণ পূর্ববর্তী কোন নবীই যে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার নবী হতে পারবেন না, উম্মতও হতে পারবে না, তা স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছেন আল্লাহ্‌তা'লা মূসা (আঃ)-কে। লক্ষণীয় যে, এই হাদীসে আঁহযরত (সাঃ)-এর উম্মতের মধ্য থেকে উম্মতি নবী হওয়ার যে কথা, তা স্বয়ং আল্লাহ্‌ই বলেছেন মূসা (আঃ)-কে। এই হাদীসটির সংকলন করেছেন মোহতারম মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেবও তাঁর রচিত 'খতমে নবুওয়ত' পুস্তকে। এবং তিনি এই হাদীস সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন,

যখন তিনি (মূসা-আঃ) এই উম্মতের নবী হতে পারেননি, তখন অন্য কেউ আঁ হযরত (সাঃ)-এর পর কীভাবে নবুওয়তের পদ ও মর্যাদা লাভ করতে পারবেন? অর্থাৎ শ্রদ্ধাস্পদ মুফতী সাহেব বলেছেন, যেহেতু মূসা (আঃ) এই উম্মতের নবী হতে পারবেন না, অতএব, অন্য আর কেউই নবী হতে পারবেন না। কিন্তু কথাটা কি তা-ই ? কথা তো হচ্ছে, এখানে আল্লাহ্ই স্বয়ং বলছেন যে, তাদের নবী তাদের মধ্য থেকেই হবে। এবং মূসা (আঃ) কেন উম্মতে মুহাম্মদীয়ার নবী হতে পারবেন না, সে কথাও আছে আল্লাহ্র ঐ কথার মধ্যে। অতএব, উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্য থেকে উম্মতি নবী হবেন, এটাই এই পবিত্র হাদীসের প্রতিপাদ্য বিষয়।

(দ্রঃ খতমে নবুওয়ত ঃ পৃঃ ৩৪৫, ৩৪৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ)

জানা দরকার যে, পূর্ববর্তী নবীগণ সরাসরি মনোনীত হতেন আল্লাহ্ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে। সরাসরি ও প্রত্যক্ষ মনোনয়নের এই ধারা সমাপ্ত হয়েছে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মধ্যে এসে। মনে রাখতে হবে যে, নবী মনোনয়নের এই ধারা নবী আগমনের ক্রমধারা নয়। কেননা, নবীগণের আগমনের কোন ক্রমধারা নেই। একই সঙ্গে একাধিক নবীর আগমন ঘটেছে। যেমন, মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে হারুন (আঃ)ও নবী ছিলেন; এবং হারুন (আঃ) মূসা (আঃ)-এর পরে নবী হয়েও আগেই ইন্তেকাল করেছেন। তাছাড়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নবী একই সময়ে আপন কাজে নিয়োজিত ছিলেন, আর তাঁরা সকলেই ছিলেন সরাসরি আল্লাহ্র মনোনীত। সরাসরি নবী মনোনয়ন করার এই যে ধারা অব্যাহত ছিল, তার পরিসমাপ্তি ঘটেছে রসূলে পাক (সাঃ)-এর মধ্যে এসে; এই অর্থেই তিনি (সাঃ) আখেরী নবী। অবশ্য, একথাও মনে রাখতে হবে, এবং তা ভুলে গেলে চলবে না যে, রসূলে পাক (সাঃ) বলেছেনঃ

"إِنِّي مَكْتُوبٌ عِنْدَ اللهِ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ" (مسند احمد، كنز العمال)

'আদম যখন কাদা পানিতে গড়াগড়ি যাচ্ছিল তখনও আমি আল্লাহ্র কাছে খাতামুন্নবীঈন রূপে লিখিত ছিলাম'।

সুতরাং, এই সত্য অতিশয় স্পষ্ট যে, রসূলে করীম (সাঃ)-ই হলেন সর্বপ্রথম নবী, আদম (আঃ)-এর পূর্বেও তিনি ছিলেন খাতামুন্নবীঈন। এক কথায়, তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ এবং তারও চেয়ে বড় কথা হচ্ছে তিনিই

পূর্ণ এবং একমাত্র সম্পূর্ণ ও সমগ্র । অতএব তাঁর পূর্ণ শরীয়তের পূর্ণ শিক্ষায় পূর্ণ মানব অর্থাৎ নবী তৈরী হবে। অন্য কথায়, আমাদের নেতা ও প্রভু মুহাম্মদ (সাঃ) হচ্ছেন সেই কামেল ইনসান ও নবী যাঁর হাতে নবী তৈরী হতে পারে এবং হয়েছেও আল্লাহ্‌র ফযলে। তাঁর (সাঃ) পবিত্র ও মোবারক হাতে শুধু সৎ মানুষ সালেহ ,শহীদ ও সিদ্দীকই তৈরী হয় না, –নবীও তৈরী হয় (৪২৭০)। এক কথায় তিনি (সাঃ) নবী তৈরীকারী নবী। এবং এই আধ্যাত্মিক মহা শক্তির অধিকারী একমাত্র তিনিই। তাই তিনি অনন্য ও অনুপম। তিনি খোদার দৃষ্টিতে মুহাম্মদ-প্রশংসিত। এবং খোদা কর্তৃক এই প্রশংসিতের জন্য মানবের মধ্যেও এক জন পূর্ণ প্রশংসাকারীর অর্থাৎ এক জন 'আহ্‌মদ'-এরও প্রয়োজন। এবং সেই প্রশংসিত এর পূর্ণ আনুগত্য বা গোলামী ছাড়া, তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণ বিলীন বা ফানা হয়ে যাওয়া ছাড়া সম্ভব হবে না সেই প্রশংসাকারীর পক্ষে স্বীয় প্রভুর (সাঃ) যথার্থ প্রশংসা করা। অতএব লোহা যেমন অগ্নির মধ্যে থেকে অগ্নির রং ও গুণ প্রাপ্ত হয়, সেরূপ এই প্রশংসাকারী তার প্রভুর রঙে রঙিন হয়ে উঠবেন, প্রভুর গুণাবলীতে গুণান্বিত হবেন এবং 'গোলাম আহ্‌মদ' নামধারী হবেন। অর্থাৎ তিনি তাঁর প্রভুর (সাঃ) গোলামও হবেন, আহ্‌মদও হবেন।

এইরূপ অতীব দুর্লভ ও মহিমান্বিত আধ্যাত্মিক অবস্থানে বা রূহানী মোকামে উন্নীত ব্যক্তিগণ 'নবী' নামে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য বা হকদার। যদিও প্রকাশ্যে তাঁদেরকে 'নবী' নামে ডাকা হয়নি। এক হাদীসে আছে আমার উম্মতের (হকীকী) আলেমরা বনী ইসরাঈলী নবীগণের সমতুল্য (বাহজাতুন নাযার- নাযহাতুন নাযার- শারাহনুখবা) হাদীসটির মর্মের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে স্বীকার করতে হবে যে,এই হাদীস সহীহ্‌ অন্ততঃ এর মর্ম সহীহ্‌। সুতরাং স্বীকার করতে হবে যে, উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে এমন অনেক হকীকী আলেম গত হয়ে গেছেন, যাঁরা এবং বনী ইসরাঈলী নবীরা এক সমান। স্বীকার করতেই হবে যে, এই উম্মতের বড় বড় ওলীআল্লাহ্‌ , ইমাম বা ইমামুজ্জামানগণের অনেকেই ছিলেন বনী ইসরাঈলী নবীগণের সমান। এই যে সমান সমান অবস্থান বা মোকাম, তাকেই পরিষ্কার বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে একজনের কথা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করা হয়েছে এবং তাঁকে ডাকা হয়েছে ঈসা মসীহ্‌ ইবনে মরিয়ম নামে। আর এখানেই নিহিত আঁ-হযরত (সাঃ)-এর অতুল শ্রেষ্ঠত্বের এবং অনন্য পূর্ণত্বের মহামহিমা। 'মুহাম্মদী' একক রেসালত ও নবুওয়তের আলোকের এই রূহানী হকীকত ও মারেফাত যে বুঝে সে ভাগ্যবান, খোদার ফযলে তার পতন নেই।

মুহাম্মদী নবুওয়তের এই অসীম ও অনন্য সাধারণ রূহানী মহাশক্তি, পবিত্রকরণ শক্তি ও সর্বমঙ্গলময় ক্ষমতার সঙ্গে যার পরিচয় নেই সে-ই শুধু ধারণা করতে পারে যে, এই মহামহিমান্বিত নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর খায়রা উম্মত বা উৎকৃষ্ট উম্মতের সংশোধনের জন্য এই উম্মতকে পুনর্জীবিত করার জন্য এবং তাঁর (সাঃ) পরিপূর্ণ ধর্ম ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ববর্তী এক নিম্ন মর্যাদার উম্মতের এক নবীর আগমন ঘটবে। তাঁরা ঈসা (আঃ)-এর 'নাযিল' হওয়া সংক্রান্ত হাদীস দেখেই মনে করেন যে, নাযিল হওয়া মানেই আসমান থেকে 'অবতরণ' করা এবং 'পুনরাগমন' করা। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, নাযিল শব্দের এক অর্থ 'অবতরণ' হলেও 'পুনরাগমন' নয়। কোথাও গিয়ে ফিরে আসা বা প্রত্যাবর্তন করার আরবী শব্দ 'আউদুন রুজু' তারা খেয়াল করতে চান না যে, কোরআন করীমও নাযিল হয়েছে, আঁ-হযরত (সাঃ)ও নাযিল হয়েছেন। (৪৩:৩২, ৭৩:১৬)। কোরআন শরীফে আছে আল্লাহ্ লোহা নাযিল করেছেন, গবাদি পশু নাযিল করেছেন (৫৭:২৬, ৩৯:৭) ইত্যাদি। অতএব, ঈসা (আঃ) নাযিল হবেন তার অর্থ কোনমতেই এ নয় যে, তিনি আকাশ থেকে নেমে আসবেন। আকাশ থেকে কোন নবীই নেমে আসেন নি। ধর্মের ইতিহাসে এর কোন নযীর নেই। তাছাড়া যারা ঈসা (আঃ)-এর বিনা পিতায় জন্ম গ্রহণ করাকে অলৌকিক মনে করেন, অনন্য ঘটনা মনে করেন, তাঁরা জানেন না যে, বাইবেলে আছে সম্রাট সিদক সালিমের জন্ম হয়েছিল বিনা পিতায়। হিন্দু পুরাণ কাহিনীতেও কারো কারো বিনা পিতায় জন্ম গ্রহণের কথা আছে। তাঁরা তো এ বিশ্বাসও রাখেন যে, আদম (আঃ)-এর জন্ম হয়েছিল বিনা পিতা ও বিনা মাতায় এবং হাওয়া (আঃ)-এর জন্ম হয়েছিল আদম (আঃ)-এর পাঁজরের হাড় থেকে। বিনা পিতায় জন্ম হওয়ার কারণে ঈসা (আঃ) যদি আজও অব্দি বেঁচে থাকতে পারেন তাহলে আদম ও হাওয়া (আঃ)-এর আজও অব্দি বেঁচে থাকার কথা। কিন্তু তাঁরা কি বেঁচে আছেন ? আমরা জানি তাঁদের ওফাৎ হয়েছে এবং আমরা এও জানি যে, ঈসা (আঃ)ও মারা গেছেন। প্রচলিত সেই কেস্সাটা যদি বিশ্বাস করা হয় যাতে বলা হয়েছে যে, ক্রুশে লটকাবার সময় ঈসা (আঃ)-এর মুখাকৃতি অন্য একটা লোককে দিয়ে তাকে ক্রুসে লটকায়ে হত্যা করা হয়েছে কিংবা ঈসা (আঃ)-এর আত্মাকে দেহ বদল করে অন্য একটা দেহের মধ্যে সংস্থাপন করা হয়েছিল এবং বদলী আত্মাওয়ালা লোকটাকেই প্রকৃত ঈসা (আঃ) মনে করে তাকেই ইহুদীরা ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করেছিল, তাহলে এই উভয় ক্ষেত্রেই ইহুদীরা নির্দোষ বলে প্রমাণিত হবে। কেননা, ইহুদীরা ঐ সময় চাক্ষুষ যা দেখেছে তা হচ্ছে তারা ঈসা ইবনে

মরিয়মকেই ক্রুশে লটকিয়েছে। ঐ লটকানো ব্যক্তি প্রকৃত ঈসা (আঃ) ছিল কিনা, কিংবা তার দেহের মধ্যে ঈসা (আঃ)-এর রূহ ছিল কি না সেটা তাদের জানার আয়ত্তের বাইরের ব্যাপার ছিল। সুতরাং তারা সঙ্গত কারণেই দাবী করবে এবং করেও যে, তারা ঈসা মসীহ্ ইবনে মরিয়মকেই ক্রুশে লটকিয়ে হত্যা করেছে। এবং যেহেতু সে অভিশপ্ত মৃত্যু বরণ করেছে, সেহেতু সে মিথ্যাবাদী এবং তার আত্মা আল্লাহ্‌র দিকে রাফা লাভ করেনি বা উন্নীত হয়নি। তাছাড়া,দেহবদলের ঐ রকম আজগুবী কোন ঘটনা ঘটে থাকলেও তার অর্থ হবে মৃত্যু। কেননা, দেহ থেকে আত্মা আলাদা হওয়ার নামই মৃত্যু। এক্ষেত্রেও ইহুদীদের দাবীই সঠিক প্রমাণিত হবে যে, ঐ ব্যক্তি আসলে মসীহ্ (আঃ) ছিলেন না, ছিল ভন্ড এক ব্যক্তি ,অভিশপ্ত এক ব্যক্তি।

অপরদিকে, পাদ্রীরা মনে করেন যে, ঈসা (আঃ) তাদের বিশ্বাস মতে ঈশ্বর পুত্র যীশু) ক্রুশবিদ্ধ অবস্থার মৃত্যু বরণ করেছেন ঠিকই কিন্তু তিন দিন পরে পুনর্জীবিত হয়ে স্বর্গে গেছেন স্বীয় পিতার কাছে। এই উভয় বিশ্বাস মতে অর্থাৎ ইহুদী ও খৃষ্টানদের এই প্রকার ক্রুশীয় বিশ্বাস মতে - তাদেরকে, বিশেষতঃ খৃষ্টানদেরকে স্বীকার করতে হবে যে, ইউনুস (আঃ)-এর ন্যায় এক নিদর্শন দেখাবার যে অঙ্গীকার ছিল ঈসা (আঃ)-এর ক্ষেত্রে তা পূর্ণ হয়নি। কেননা, সেমতাবস্থায় ঈসা (আঃ)-এর তিন দিবস মৃত্তিকা গর্ভে থাকার কথা যেমন ছিলেন ইউনুস (আঃ) তো সেই মাছের পেটে মৃত অবস্থায় ছিলেন না, তিনি ছিলেন মৃতবৎ অবস্থায়, বেহুঁশ অবস্থায়। কাজেই,খৃষ্টানদের বিশ্বাস মতে, যীশু যদি মৃত্তিকা গর্ভে মৃত অবস্থায় থেকে থাকেন, তাহলে মানতে হবে যে,নিদর্শন দেখাবার ঐ অঙ্গীকার পূর্ণ হয়নি। কেননা মৃত্তিকা গর্ভে তাঁর থাকার কথা মৃতবৎ অবস্থায়, বেহুঁশ অবস্থায়, মৃত অবস্থায় নয়। অধিকন্তু যদি ধরে নেয়া হয় যে, যীশু সত্যিসত্যিই মৃত্যুবরণ করে ছিলেন তাহলে আরও একটা বিষয় প্রমাণিত হবে যে, সেই সংকটের সময়ে যীশুর যে প্রার্থনা ‘এলি, এলি, লামা সাবাক্তানী - প্রভু হে, হে আমার প্রভু! তুমি কি আমায় পরিত্যাগ করেছ’ ? সেই কাতর প্রার্থনাও খোদা কবুল করেন নি। কিন্তু তা তো হতে পারে না এবং তা হয়ও নি। প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে এবং যা ঘটেছে তা হচ্ছে ইউনুস (আঃ) যেমন তিন দিন পর মাছের গর্ভ থেকে নির্গত হয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন, ঠিক তেমনি ঈসা (আঃ)ও মৃত্তিকা গর্ভ থেকে নির্গত হয়ে পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন অন্যান্য নবীদের মতই। অতঃপর তাঁর উপরে ন্যস্ত নবুওয়তের দায়িত্ব পালন করার পর,

পরিণত বয়সে স্বাভাবিকভাবে দেহত্যাগ করেন এবং আল্লাহ্র দিকে উন্নীত হন, বা রাফা লাভ করেন।

(এগার)

খৃষ্টানদের ক্রুশীয় বিশ্বাসটা এত বড় মিথ্যা ও এত জঘন্য যে, কোরআন করীম তীব্র জোরালো ভাষায় তা বাতিল করে দিয়েছে। (১৮ঃ ৪ ; ১৯ ঃ ৯১, ৯২)। খৃষ্টানরা বিশ্বাস করে যে,ক্রুশে বিদ্ধ অবস্থায় যীশুর যে রক্ত পাত হয়েছে সেই রক্তে দুনিয়ার তাবৎ মানুষের পাপমোচন হবে এবং তারা পরিত্রাণ বা নাজাত পাবে। একের রক্তে অন্যের পাপ মোচন ও পরিত্রাণ লাভ যে সর্বৈব অলীক ও ভ্রান্ত একটা বিশ্বাস, তা বোধ করি কোন বিবেকবান মানুষকে বলে দিতে হবে না। ধর্মে প্রকৃত প্রস্তাবে এই জাতীয় শঠতার কোন স্থান নেই।

যীশুর রক্তে পাপমোচন ও পরিত্রাণ লাভের এই বিশ্বাসটার কারণেই আজ সারা খৃষ্টান দুনিয়ায় পাপাচারের তুফান বইছে, বন্যা বইছে। পাপ করতে তাদের কোন বাধা নেই, না নৈতিকভাবে, না ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক ভাবে। কারণ তারা তো নাজাত পেয়েই যাবে যীশুর রক্তে। অতএব তারা আজ মুসলিম দেশ বসনিয়া হার্জেগোভিনায় মানবেতিহাসের নিষ্ঠুরতম যুলুম নির্যাতন এবং পৈশাচিকতম হৃদয়-বিদারী পাপাচার চালিয়ে যাচ্ছে। তারা সেখানে নির্দ্বিধায়, নির্বিচারে আবালবৃদ্ধ বণিতা সবার বিরুদ্ধে নির্মমভাবে পাইকারী গণ হত্যা চালাচ্ছে। তারা পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন করে জনপদের পর জনপদ জনশূন্য করে ছাড়ছে। এই সকল জঘন্য নারকীয় কান্ড করে চলেছে তারা ইউরোপ -আমেরিকার বাকী খৃষ্টান দুনিয়ার চোখের সামনেই। তাদের ধর্মগুরু পোপ পর্যন্ত বলেছেন যে, এই সমস্ত অত্যাচার ও নির্যাতন পৃথিবীর ইতিহাসে এক কথায় নিষ্ঠুরতম। বৃটেনের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী মিসেস থ্যাচারও বলেছেন যে, অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে যে, পাশ্চাত্য শক্তিসমূহ সার্বদের ঐ সকল কর্মকান্ডের সহযোগিতাই করছে। সেখানে সার্বীয় খৃষ্টান রাষ্ট্রনেতারা ও সেনাপতিরা প্রকাশ্যে হুকুম জারি করে তাদের সেনাবাহিনীর জোয়ানদের দ্বারা মুসলমান নারীদের উপরে প্রকাশ্যে পাশবিক নির্যাতন চালাচ্ছে, ফলে, এই অতি পাশবিক নির্যাতনের করাল গ্রাসে, মৃত্যুর মুখে পতিত হচ্ছে ৬/৭ বছরের শিশু বালিকারা। এবং ১৩/১৪ বছরের কিশোরীরা উন্মাদিনী হয়ে যাচ্ছে । ... মুসলিম নারীদের গর্ভে তাদের ঔরসে খৃষ্টান জন্মাবে বলে তারা মুসলিম নারীদের বন্দীগি করে রেখেছে।

ইত্যাকার অতি বীভৎস নারকীয় পাপ ও অত্যাচার তারা চালাতে পারে, এবং চালাতে পারছে এই বিশ্বাসে যে, যীশুর রক্তে তাদের সমস্ত পাপ ধুয়ে মুছে যাবে,তারা পরিত্রাণ পেয়ে যাবে। খোদাতা'লার কাছে তাদের কোনও জবাবদিহি করতে হবে না।

ক্রুশীয় এই জঘন্য মিথ্যা বিশ্বাসটাকে সমাধিস্থ করতে হবে। এই ক্রুশীয় মতবাদ ভাঙ্গতে হবে। ইহাই দজ্জালিয়াৎ ইহাকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে। নইলে ইসলামের পুনর্জীবন সম্ভব নয়। মুসলিম উম্মাহ্‌র নব জীবন লাভ সম্ভব নয়। সম্ভব নয় মানবতার পরিত্রাণ লাভ। এ কারণেই বলা হয়েছে হাদীস শরীফে যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ ইবনে মরিয়ম ক্রুশ ভঙ্গ করবেন ঃ

يُوْشِكُ مَنْ عَاشَ مِنْكُمْ اَنْ يَلْقٰى عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اِمَامًا مَهْدِيًّا حَكَمًا عَدَلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعُ الْحَرْبَ (مسند احمد بن حنبل)

"তোমাদের মধ্যে যাহারা বাঁচিয়া থাকিবে তাহারা ঈসা ইবনে মরিয়মকে দেখিতে পাইবে ইমামান মাহ্‌দীয়ান হাকামান আদলানরূপে; তিনি ক্রুশ ভঙ্গ করিবেন, শূকর নিধন করিবেন এবং ধর্মযুদ্ধ রহিত করিয়া দিবেন" (মুসনাদ আহ্‌মদ বিন হাম্বল)। এবং ক্রুশভঙ্গের এই নির্ধারিত কাজটি যিনি সমাধা করেছেন তিনিই হচ্ছেন হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী (আঃ)। এই হাদীস মতে তিনিই ইমাম, তিনিই মাহ্‌দী, তিনিই হাকাম, তিনিই আদেল। অতএব প্রতিশ্রুত মসীহ্ যিনি তিনি হচ্ছেন প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্‌দী, অপর কেউ নন। তাই অন্য এক হাদীসে বলা আছে ঃ

لَا الْمَهْدِيُّ اِلَّا عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ (ابن ماجه باب شدة الزمان)

"নাই কোন মাহ্‌দী ঈসা ইবনে মরিয়ম ছাড়া" (ইবনে মাজা ঃ বাবু সিদ্দাতুয্‌যামান)।

শ্রদ্ধাস্পদ মওলানা (মরহুম) আশরাফ আলী থানবী সাহেবের কোরআন শরীফের তফসীর গ্রন্থের ভূমিকায় লিখা হয়েছে ঃ

" মৌলবী গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী তখন রুখে দাঁড়ালেন এবং বিশদ লেফ্রাই ও তার সঙ্গীদেরকে সম্বোধন করে বললেন, 'তোমরা যে ঈসার (আঃ)

কথা বলছ, তিনি তো অন্যান্য মানুষের মতই মারা গেছেন, এবং যে ঈসার (আঃ) আগমনের সংবাদ দেওয়া আছে, সে ব্যক্তি আমিই। সুতরাং, তোমরা যদি পুণ্যবান হও, তাহলে আমাকে গ্রহণ কর। এই পন্থা অবলম্বন করে তিনি লেফ্রাইকে এমনভাবে নাজেহাল করলেন যে, তার আর পালাবার পথ রইল না। এই একই উপায়ে তিনি হিন্দুস্থান থেকে শুরু করে সুদূর ইংল্যান্ডের পাদ্রীদেরকে পর্যন্ত পরাস্ত করলেন"।

(বার)

মুসলিম শরীফের এক দীর্ঘ হাদীসে আছে ঃ

১। আল্লাহ্‌তা'লা প্রতিশ্রুত ঈসা (আঃ)-এর নিকট ওহী করবেন ;

২। তখন ইয়াজূজ ও মাজূজের আবির্ভাব ঘটবে ;

৩। তখন নবী উল্লাহ্ ঈসা ইবনে মরিয়ম পাহাড় থেকে নেমে আসবেন; ইত্যাদি

এই হাদীসে আগমনকারী ঈসা (আঃ)-কে ৪ (চার) বার 'নবী উল্লাহ্' বলা হয়েছে।

এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রতিশ্রুত ঈসা (আঃ)-এর উপরে আল্লাহ্ ওহী করবেন, তিনি নবী হবেন, এবং একজন উম্মতিও হবেন, অর্থাৎ তিনি হবেন আঁ হযরত (সাঃ)-এর একজন উম্মতি নবী, কোন শরীয়তবাহী, স্বাধীন ও স্বতন্ত্র নবী হবেন না। উক্ত হাদীসে আরও আছে ঃ

ক) ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ) নাযিল হবেন সাদা মিনারার কাছে ; এর অর্থ, তিনি প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণসহ আগমন করবেন ;

খ) তিনি (আঃ) দুইজন ফেরেশ্‌তার ডানায় ভর করে নামবেন, এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্‌র প্রত্যক্ষ সাহায্য ও সহায়তা নিয়ে আগমন করা ;

গ) তিনি মাথা নীচু করলে মুক্তার মত জলবিন্দু টপ টপ করে ঝরতে থাকবে ;

এর অর্থ দোয়ারত, সিজদারত অবস্থায় অঝোরে চোখের জল ঝরা; অন্যথায় সত্য সত্যই পানি ঝরতে থাকলে তো তার পক্ষে চলা ফেরা করাই মুশকিল হবে।

ঘ) তাঁর নিঃশ্বাসে কাফের মারা যাবে -

অর্থাৎ তাঁর দোয়ায় ও মোবাহালায় শত্রু ধ্বংস হবে। এথেকে এও প্রমাণিত হয় যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ) যুদ্ধ করবেন না। বরং প্রার্থনা যুদ্ধ বা মোবাহালা করবেন। এবং এজন্যই হাদীসে তাকে বলা হয়েছে 'ইউযাউল হার্ব'-যুদ্ধ রহিতকারী।

এই হাদীসের উক্ত বর্ণনাসমূহ 'কাশ্‌ফী'। তাই এগুলোর ব্যাখ্যা বা তাবীর করে বুঝতে হবে। কিন্তু তা না করে এগুলোকে অনেকেই আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করে বসে আছেন। ফলে, তাদের সেই ভ্রান্ত বুঝটাই হয়েছে তাদের সামনে প্রধান অন্তরায় প্রতিশ্রুত ঈসা (আঃ)-কে মানার পথে।

(তের)

উপরে উল্লেখিত ঈসা (আঃ)-এর যে কথা 'ফালাম্মাতাওয়াফ্-ফায়তানী কুনতা আনতার রকীবা আলায়হিম ' (যখন তুমি আমাকে ওফাৎ দিলে, তারপরে তুমিই তো ছিলে তাদের তত্ত্বাবধানকারী), সেই কথাটির তাৎপর্য নিয়ে আরও দু'একটা কথা আমরা বলতে চাই ।

ঈসা (আঃ)-এর ঐ কথার প্রসঙ্গ হলো,- আল্লাহতা'লা কেয়ামতের দিন সকল নবীকে তাদের স্ব স্ব উম্মতের সাক্ষী হিসেবে ডাকবেন। ঈসা (আঃ)-কেও ডাকবেন। আঁহযরত (সাঃ)-কেও ডাকবেন। আল্লাহ্ ঈসা (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করবেন - 'তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে যে, আল্লাহ্‌কে ছেড়ে আমাকে এবং আমার মা-কে দু'জন মাবূদ রূপে গ্রহণ কর। ' উত্তরে ঈসা (আঃ) বলবেন, আমি তেমন কিছুই তাদেরকে বলিনি বরং আমি তাদেরকে কেবল সেই কথাই বলেছিলাম যার আদেশ তুমি আমাকে দিয়েছিলে। (আমি বলেছিলাম), 'তোমরা ইবাদত কর আল্লাহ্‌র, যিনি আমারও প্রভু এবং তোমাদেরও প্রভু এবং আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি তাদের উপরে সাক্ষী ছিলাম; কিন্তু যখন তুমি আমার মৃত্যু (ওফাৎ) দিলে, তারপর তুমিই তো ছিলে তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক।'

আঁ হযরত (সাঃ) যখন তাঁর উম্মতের জন্য সাক্ষ্য দিতে আসবেন তখন দেখবেন যে, তাঁর কিছু সংখ্যক সাহাবীকে দোযখের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এতে তিনি বলবেন, 'ওরা তো আমার সাহাবী, ওরা তো আমার সাহাবী।' (ওদেরকে কেন দোযখের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?)। তখন

আল্লাহ্ তাঁকে বলবেন যে, ওরা তোমার পরে পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তখন রসূলে পাক (সাঃ)ও ঈসা (আঃ)-এর মতই বলবেন-'ফালাম্মা তাওয়াফ্ফাণীতায় কুনতা আনতার্ রকীবা আলায়হিম' (যখন তুমি আমাকে ওফাৎ দিলে, তারপর তুমিই ছিলে তাদের উপরে তত্ত্বাবধায়ক)। লক্ষ্যণীয় যে, কেয়ামতের দিনে আঁ হযরত (সাঃ) ঠিক সেই কথাই বলে তাঁর মৃত্যু হয়ে যাওয়ার কথা প্রকাশ করবেন যা ঈসা (আঃ) বলবেন আল্লাহ্র কাছে তাঁর ওফাৎ হয়ে যাওয়া সম্বন্ধে। অতএব, এই 'ওফাৎ' অর্থ যে স্বাভাবিক মৃত্যু তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

অতঃপর, যদি মনে করা হয় যে, ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে নেমে আসবেন এবং উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে শামিল হবেন, এবং পরে মারা যাবেন, তাহলে ঐ কেয়ামতের দিনে ঈসা (আঃ)-এর অবস্থাটা কী দাঁড়াবে ? তাঁকে একদিকে তো আল্লাহ্ ডাকবেন তাঁর উম্মত বনী ইসরাঈলের বা হাওয়ারীদের পক্ষে সাক্ষ্যদানের জন্য, অপরদিকে রসূলে পাক (সাঃ)-এর উম্মতি হিসেবে তাঁকে অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে। তিনি না পারবেন খোদাতা'লার ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর উপ্রে ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করতে, না পারবেন আঁ হযরত (সাঃ)-এর অনুগত থেকে তাঁর সহযোগিতা করতে। তিনি না পারবেন ওদিকে যেতে, না পারবেন এদিকে থাকতে। তখন তিনি করবেনটা কি?

আসল কথা হচ্ছে, প্রত্যেক নবীই হবেন তাঁর নিজ উম্মতের জন্য সাক্ষী- (৪ঃ৪২)। এক উম্মতের নবী অন্য কোনও উম্মতের উপরে সাক্ষী হতে পারবেন না। তেমন দায়িত্ব আল্লাহ্ কোন নবীকেই দেননি। কাজেই কেয়ামতের দিনে ঈসা (আঃ)-কে ডাকা হবে তাঁর উম্মত বনী ইসরাঈলীদের উপর সাক্ষ্যদানের জন্যই, উম্মতে মুহাম্মদীয়ার জন্য নয়। সেদিন তিনি যদি উম্মতে মুহাম্মদীয়ার হয়ে জবাব দিহির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকেন তাহলে, তাঁর অবস্থাটা দাঁড়াবে -একদিকে তিনি যেমন তাঁর দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হবেন (মায়াযাল্লাহ্), তেমনি অপরদিকে, বনী ইসরাঈল বা হাওয়ারীরা তাদের নিজেদের নবীকে না পেয়ে বিপাকে পড়বে। কিন্তু তা হয় না, এবং হয় না বলেই এটাই সত্য যে, ঈসা (আঃ) বনী ইসরাঈলী নবী এবং বনী ইসমাঈলী বা উম্মতে মুহাম্মদীয়ার জন্য তাঁর কোন দায়-দায়িত্ব নেই। অতএব, তাঁর আজও পর্যন্ত আকাশে বেঁচে থাকা, তাঁর পুনরাগমন এবং তাঁর উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে শামিল হওয়ার ধারণাগুলো সব বানোয়াট এবং অলীক এবং বিল্কুল বাতিল।

(চৌদ্দ)

আল্লাহ্‌তা'লা কোরআন করীমে বলেছেন ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ

'এবং নিশ্চয় আমরা বনী ইসরাঈলকে , কিতাব, হুকুমত এবং নবুওয়ত দান করিয়াছিলাম --"(৪৫ ঃ১৭)।

কিন্তু, এখন যদি বলা হয় যে, বনী ইসরাঈলী নবী ঈসা (আঃ) জীবিত আছেন আজও পর্যন্ত, তাহলে সেই সঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হবে যে, তাদের মধ্যেকার নবুওয়তও এখন পর্যন্ত জারি আছে, তাদের কেতাবও রহিত হয়ে যায়নি, এবং তাদের রাজত্ব ও সার্বভৌমত্ব অদ্যাবধি অক্ষুন্ন রয়েছে। কিন্তু আমরা জানি ইতিহাস সাক্ষী যে, বনী ইসরাঈলীকে প্রদত্ত কেতাব-তৌরাত, যবুর, ইঞ্জিল সব মনসুখ বা রহিত হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে জারিকৃত নবুওয়তের সিলসিলাও বন্ধ হয়ে গেছে, তাদের কোন নবীও জীবিত নেই, ঈসা (আঃ)ও জীবিত নেই। তাদের কোন হুকুমত বা রাজত্বও নেই। এক কথায় হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর আবির্ভাবের সঙ্গে ঐ সমস্ত নেয়ামতই বনী ইসরাঈলীদের মধ্য হতে উঠে গেছে এবং তা সবই পুর্ণ আকারে জারি হয়ে গেছে বনী ইসমাঈলীদের মধ্যে তথা উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে এবং তা অব্যাহত ধারায় প্রবহমান থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত।

আপনি হয়তো বলতে চাইবেন যে, কেন এখন তো আবারও ইস্‌রাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হ্যাঁ হয়েছে কিন্তু তা অতি সাময়িকভাবেই হয়েছে। অতঃপর, বলা যায়, ইহুদী ও ইহুদীয়্যত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ধরা পৃষ্ঠ থেকে । নিশ্চিহ্ন হবার আগে তাদেরকে আবার একত্রিত করা হয়েছে আল্‌ কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারেই। যেমন বলা আছে ঃ

وَقُلْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ لِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اسْكُنُوا الْاَرْضَ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ
جِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفًا

"এবং তাহার পর আমরা বনী ইসরাঈলকে বলিলাম, তোমরা এই (প্রতিশ্রুত) যমীনে বসবাস কর অতঃপর যখন পরবর্তী কালের (আযাবের) প্রতিশ্রুতি (পূর্ণ হইবার সময়) আসিবে, তখন আমরা তোমাদের সকলকে (বিভিন্ন দেশ হইতে) গুটাইয়া লইয়া আসিব" (১৭ঃ১০৫)।

উল্লেখিত আয়াতের ব্যাপকতর তাৎপর্য আছে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটা সত্য দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর তথাকথিত 'বেলফোর ঘোষণা' নামক এক দাজ্জালী চক্রান্তের অন্তরালে পাশ্চাত্যের শক্তিগুলো আজকের এই ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈলের পত্তন করে নিয়েছে ১৯৪৮ সালে। তখন থেকেই, দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকা থেকে 'যাযাবর' ইহুদীদেরকে গুটিয়ে আনা হচ্ছে ঐ ইসরাঈল রাষ্টে, যে প্রক্রিয়াটা এখনও বন্ধ হয়নি। আল্ কোরআনের এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার সময়কালকে চিহ্নিত করে গেছেন অনেক প্রসিদ্ধ মুসলিম উলেমা প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ)-এর যামানা বলে (ফাতহুল বায়ান)। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, - ইহুদীদেরকে গুটিয়ে আনা হচ্ছে, এবং তার প্রতিক্রিয়াতে মুসলমানরাও আযাবে পতিত হয়েছে, কিন্তু সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ) কোথায় ? বলা দরকার যে, এই ঐতিহাসিক আযাব যে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ)-এর যামানাতে ঘটবে, তার একটা প্রামাণ্য দলীল হচ্ছে আল্লাহ্র সেই চিরাচরিত নীতি ঃ

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ⑯

"আমরা কোন রসূল (সতর্ককারীরূপে) না পাঠাইয়া আযাব (শাস্তি) প্রেরণ করি না" (১৭ঃ১৬) ।

অতএব, খোদাতা'লার এই সুন্নত বা নীতির আলোকে যুক্তি গ্রাহ্য সিদ্ধান্ত এটাই দাঁড়ায় যে, ইহুদীদেরকে বিভিন্ন দেশ থেকে গুটিয়ে আনবার পূর্বেই, ইসরাঈল রাষ্ট্র পত্তন হওয়ার পূর্বেই, মুসলমানদের উপরে আযাব শুরু হওয়ার পূর্বেই, আল্লাহ্র এক রসূলেরও আগমন ঘটে গেছে এই পৃথিবীতে । এবং বলাই বাহুল্য , সতর্ককারী সেই রসূল হচ্ছেন উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে আগমনকারী মুহাম্মদী মসীহ্ ও মাহ্দী (আঃ)। যার আবির্ভাবে, আঁহযরত (সাঃ)-এর সকল ভবিৎষদ্বাণী মোতাবেক ইসলাম, এই যামানায়, নবজীবন লাভ করছে। বিশ্বধর্ম ইসলামের বিশ্ব বিজয়ের লক্ষ্যে বিশ্ব আন্দোলন গড়ে উঠছে।

কথা তো ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস, জেরুযালেম তথা ফিলিস্তীন থাকবে আল্লাহ্র সৎ বা সালেহ্ বান্দাদের হাতে। যেমন বলা আছে কোরআন মজীদেঃ

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصّٰلِحُوْنَ ⑩

"এবং (ইতোপুর্বে) আমরা যবুরে উপদেশবাণীর পর ইহা লিখিয়া দিয়াছি যে, আমার সালেহ বান্দাগণ এই (পবিত্র) ভূমির উত্তরাধিকারী হইবে" (২১ঃ১০৬)।

কিন্তু, এখন তো তা চলে গেছে ইহুদীদের হাতে। এই লজ্জাঙ্কর ও দুঃখবহ ঘটনা থেকে এটাই কি প্রমাণিত হয় না যে, এখন মুসলমানরা আর আল্লাহ্‌র বিবেচনায় সালেহ্ বান্দা নেই। পক্ষান্তরে ইহুদীরাই এখন সালেহ্ বান্দারূপে বিবেচিত ? ইতিহাসকার তো বলবে,- শর্ত যদি এই হয় যে, বায়তুল মুকাদ্দাস, জেরুসালেম এবং প্যালেস্টাইন আল্লাহ্‌র সালেহ্ বান্দাদের অধিকারে থাকবে, তাহলে স্বীকার না করে উপায় থাকবে না যে, বর্তমান যামানার মুসলমানরা অধঃপতিত হয়েছে, তারা ইহুদীদের চাইতেও হেয় প্রতিপন্ন হয়েছে। হাদীস শরীফেও বলা আছে যে, এক যামানা আসবে যখন উম্মতের লোকেরা অনেকেই ইহুদীদের মত নিকৃষ্ট হয়ে যাবে। এখন তাহলে, মুসলিম উম্মাহ্‌র মুক্তি ও উন্নতির উপায় কি ? আমরা জানি উপায় আছে, এবং তা হচ্ছে ইহুদীদের ঐ ক্রুশীয় বিশ্বাসটাকে ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় যুক্তি- প্রমাণ দ্বারা ভেঙ্গে ফেলা । ইহুদীরা যে বিশ্বাস করে তারা ঈসা (আঃ)-কে অভিশপ্তরূপে ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করেছে. তাদের সেই মিথ্যে বিশ্বাসটাকে ভেঙ্গে ফেলা যে, না, ঈসা (আঃ) তেত্রিশ বছর বয়সে তোমাদের ঐ ক্রুশে লটকানোতে মারা যাননি, তিনি পরিণত বয়সে মারা গেছেন স্বাভাবিকভাবে, তাঁর প্রতি ন্যস্ত নবুওয়তের দায়িত্ব সমাধা করার পরে। এবং সেই সঙ্গে,- সমাগত ইমামুজ্জমান প্রতিশ্রুত মসীহ্‌কে মানতে হবে এবং তাঁর নির্দেশে মুসলিম উম্মাহ্‌কে পথ চলতে হবে, ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। প্যালেন্টাইনের ঐ যমীনের উপর ইহুদীদের এই সাময়িক আধিপত্যের ঘটনাটা ঘটার কথাতো ছিল প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্‌দী (আঃ)-এর যামানায়। অতএব, প্রতিশ্রুত মসীহ্-এর সময়োচিত সতর্কবাণী না মানার, বা উপেক্ষা করার কারণেই ইহুদীদের হাতে পড়ে আজ মুসলমানরা মার খাচ্ছে দিনের পর দিন। উম্মতে মুসলেমার এই না-মানার এবং উপেক্ষা করার ব্যাধি যত শীঘ্র নিরাময় হয়, ততই মঙ্গল।

আজকের ছিন্নভিন্ন এবং আত্মকলহে লিপ্ত ও বিধ্বস্তপ্রায় মুসলিম উম্মাহ্‌র- বিজাতি, বিধর্মীদের অত্যাচারে জর্জরিত এবং হতাশাগ্রস্ত মুসলিম উম্মাহ্‌র - ঐক্যবদ্ধ হওয়ার, ফের্কা.-চেতনা পরিহার করে একক ইমামতের অধীনে সংঘবদ্ধ হওয়ার, উম্মতে ওয়াহেদায় পরিণত হওয়ার পথে সর্ব প্রধান বাধা হয়ে আছে ঐ ভ্রান্ত বিশ্বাসটাঃ ঐ বনী ইসরাঈলী নবী ঈসা (আঃ)-এর

জীবিত থাকার অলীক আকিদাটা। ভুলে গেলে চলবে না যে, ঐ মিথ্যে আকিদা বা বিশ্বাসটাকে মুসলিম চিন্তা চেতনায় অনুপ্রবিষ্ট করে দিয়েছে খৃষ্টান পন্ডিত ও পাদ্রীরাই। অথচ ঐ মিথ্যে বিশ্বাসটাকে এবং তদুদ্ভূত সমস্ত কুসংস্কারকে মদফুন ঈসা (আঃ)-এর সমাধিতে দাফন না করা পর্যন্ত নিস্তার নেই মুসলিম উম্মাহ্‌র। নিস্তার নেই তাদের ইহুদী, খৃষ্টান তথা দাজ্জালিয়্যতের ক্রূর ও বিষাক্ত দংশন থেকে বাঁচবার।

ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুতেই সম্ভব মুসলিম উম্মাহ্‌র পক্ষে ইহুদী-নাসারার পাতানো চক্রান্তের ও তজ্জনিত অধীনত্বের বলয় ও নাগপাশ থেকে বেরিয়ে আসা। সম্ভব মুসলিম উম্মার ঐক্যসাধন। সম্ভব তাদের পুনর্জাগরণ, তাদের মুক্তি এবং অগ্রগতি, এবং তাদের আধ্যাত্মিক পরিত্রাণ। এক কথায়, ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুতেই আগমন ঘটেছে মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর, আগমন ঘটেছে কোরআন করীমের, আগমন ঘটেছে পূর্ণধর্ম ইসলামের। এবং এবারেও ঈসা (আঃ)-এর ঐ তথাকথিত জীবিত থাকার, আকাশে উঠে যাওয়ার ঐ অলীক ও অন্ধকার বিশ্বাস বা আকিদাটার মৃত্যুতেই সম্ভব ইসলামের নব জীবন লাভ। সেদিন সুদূরে নয় যেদিন পৃথিবীর সকল ধর্ম, পথ ও মতের উপরে বিজয় লাভ করবে ইসলাম। এবং সেই ঐশী লক্ষ্যেই বিশ্বব্যাপী প্রতিদিন প্রতিঘন্টায় অগ্রসর হচ্ছে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাত ধৈর্য ও প্রার্থনার সঙ্গে। শত বাধা, শত যুলুম তাকে প্রতিহত করতে পারেনি, পারবেও না কোনদিন। কেননা, এটাই খোদাতা'লার ডিক্রী। এটাই খোদায়ী তক্‌দীর।

(পনের)

হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু ঃ
কোরআন করীমের একত্রিশটি আয়াত থেকে প্রমাণিত

১.

إِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ
كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ

"(স্মরণ কর সেই সময়ের কথা) যখন আল্লাহ্ বললেন, 'হে ঈসা! নিশ্চয় আমি তোমাকে মৃত্যু দিব এবং তোমাকে উন্নীত করবো আমার দিকে, এবং যারা অস্বীকার করে তাদের দোষারোপ থেকে তোমাকে পবিত্র করবো, এবং যারা অস্বীকার করে তাদের উপর তোমার অনুসারীদেরকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত প্রাধান্য দিব" . . . . (সূরা আলে ইমরান ঃ ৫৬)।

২.

بَلْ رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

"বরং আল্লাহ তাকে তাঁর দিকে উন্নীত করেছেন। অবশ্যই, আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়" (নিসা ঃ ১৫৯)।

৩.

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ

"কিন্তু, যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে, তখন তুমিই ছিলে তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক, ... "(মায়েদা ঃ ১১৮)।

৪.

وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ

"এবং আহ্‌লে কিতাব (কিতাবধারীগণ) থেকে প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ মৃত্যুর পূর্বে এর উপর (ঈসার ক্রুশীয় মৃত্যুর উপর) বিশ্বাস রাখবে" . . . (নিসা ঃ ১৬০)।

৫.

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن
قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ

"মসীহ ইবনে মরিয়ম একজন রসূল ছাড়া কিছুই ছিল না; তার পূর্বেকার সকল রসূল গত হয়ে গেছে। এবং তার মা ছিল একজন সত্যবাদিণী। তারা উভয়ে খাদ্য গ্রহণ করতো . . . . (মায়েদা ঃ ৭৬)।

৬. وَمَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوْا خٰلِدِيْنَ ۝

"এবং আমরা তাদেরকে (সেই সকল রসূলগণকে) না এমন দেহ দিয়েছিলাম যে, তারা খাদ্য গ্রহণ করতো না, এবং না তারা চিরকাল বেঁচে থাকবার অধিকারী ছিল" . . . . (আল্ আম্বিয়া ঃ ৯)।

৭. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ
اَفَا۟ئِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ ؕ

"এবং মুহাম্মদ একজন রসূল ছাড়া কিছুই ছিল না; তার পূর্বেকার সকল রসূল নিশ্চয়ই গত হয়ে গেছে। অতএব, সে যদি মৃত্যুবরণ করে অথবা নিহত হয়, তাহলে কি তোমরা তোমাদের গোড়ালির উপর (তৎক্ষণাৎ) ফিরে যাবে ?" (সূরা আলে ইমরান ঃ১৪৫)

৮. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ؕ اَفَا۟ئِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ ۝

"এবং আমরা তোমার পূর্বে কোন মানুষকেই চিরস্থায়ী জীবন দান করিনি। অতঃপর, যদি তুমি মারা যাও, তাহলে কি তারা চিরকাল (পৃথিবীতে) জীবিত থাকবে ?" (আল্ আম্বিয়া ঃ ৩৫)

৯. تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا
كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

"এরা সেই জাতি যারা গত হয়ে গেছে; তাদের জন্যে তা-ই যা তারা অর্জন করেছে এবং তোমাদের জন্য তা-ই যা তোমরা অর্জন করেছ। এবং তোমরা সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে না, যা তারা করতো." . . . (বাকারা ঃ ১৪২)।

১০. وَاَوْصٰنِيْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۝

"এবং যতদিন আমি জীবিত থাকি তিনি আমাকে নামায ও যাকাত আদায় করবার বিশেষ নির্দেশ দান করেছেন" (মরিয়ম ঃ ৩২)।

১১. وَالسَّلٰمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا

"এবং আমার উপর শান্তি যেদিন আমি (ঈসা) জন্মগ্রহণ করেছিলাম এবং যেদিন আমি মৃত্যুবরণ করবো, এবং যেদিন আমাকে জীবিত করে পুনরুত্থিত করা হবে" (মরিয়ম ঃ ৩৪)।

১২.

وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔا

"এবং তোমাদের মধ্য থেকে কোন কোন ব্যক্তিকে (স্বাভাবিক বয়সে) মৃত্যু দান করা হয় এবং তোমাদের কোন কোন ব্যক্তিকে জরাজীর্ণ বার্ধক্যে উপনীত করা হয়, ফলে তারা জ্ঞানার্জনের পর সম্পূর্ণ জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে" . . . . (হাজ্জ ঃ ৬)।

১৩.

وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ

"এবং তোমাদের জন্য এক (নির্দিষ্ট) সময় পর্যন্ত এই পৃথিবীতে বসবাসের স্থান ও জীবিকা নির্বাহের উপকরণ রয়েছে" (আল্ বাকারা ঃ ৩৭)।

১৪. وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى الْخَلْقِ

"এবং আমরা যাকে দীর্ঘায়ূ দান করি – তাকে শারীরিক গঠনে ক্ষয় ও দুর্বল করতে থাকি" (ইয়াসীন ঃ ৬৯)।

১৫.

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ
ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّشَيْبَةً

"তিনিই আল্লাহ্ যিনি তোমাদেরকে দুর্বল অবস্থায় সৃষ্টি করেন এবং দুর্বলতার পর তোমাদেরকে শক্তি দান করেন, এবং সেই শক্তির পর পুনরায় দুর্বলতা ও বার্ধক্য দেন, ..." (আর রূম ঃ ৫৫)।

১৬. اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ

الْاَرْضِ مِمَّا يَاْكُلُ النَّاسُ وَ الْاَنْعَامُ

"পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত ঐ পানির ন্যায় যা আমরা মেঘ থেকে বর্ষণ করি; অতঃপর তার সাথে মিশ্রিত হয় ভূমি থেকে উৎপর দ্রব্য, যা মানুষ ও গবাদি পশু খেয়ে থাকে. . . . ." (ইউনুস ঃ ২৫)।

১৭. ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ﴿١٦﴾

"এরপর তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে" (মু'মেনূন ঃ ১৬)।

১৮. اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهٗ يَنَابِيْعَ فِي الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهٗ حُطَامًا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿٢٢﴾

"তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, যার ফলে তা তিনি ভূ-পৃষ্ঠে প্রস্রবণের আকারে প্রবাহিত করেন; অতঃপর তিনি তার দ্বারা ফসল উৎপন্ন করেন, যার বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন ? অতঃপর তা যখন পেকে শুষ্ক হয়ে যায়, তখন তুমি তাকে হলুদ বরণ দেখতে পাও, যারপর তিনি তা চূর্ণ-বিচূর্ণ খড়কুটায় পরিণত করেন। নিশ্চয় এর মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য স্মরণীয় উপদেশ রয়েছে" (যুমার ঃ ২২)।

১৯. وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّآ اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِي الْاَسْوَاقِ

"এবং আমরা তোমার পূর্বে যত রসূল প্রেরণ করেছি,তারা সকলেই আহার করতোএবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করতো" (আল্ ফুরকান ঃ২১)।

২০. وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ﴿٢٠﴾ اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَآءٍ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ﴿٢١﴾

"এবং তারা আল্লাহ্ ব্যতিরেকে যাদেরকে (উপাস্যরূপে) ডাকে তারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং তারাই সৃষ্ট।

(তারা) সকলেই মৃত, জীবিত নয়, এবং তারা জানে না কখন তাদেরকে উত্থিত করা হবে" (নহল ঃ ২১, ২২)।

২১. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ

"মুহাম্মদ তোমদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নয়, কিন্তু সে আল্লাহ্‌র রসূল এবং নবীগণের মোহর" (আল্‌ আহযাব ঃ ৪১)।

২২. وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

"এবং আমরা তোমার পূর্বেও কেবল পুরষগণকেই রসূলরূপে প্রেরণ করে এসেছি এবং তাদের প্রতি ওহী করেছি, অতএব তোমরা যদি না জান তাহলে, আহলে যিকর্‌কে (কেতাবধারীদেরকে) জিজ্ঞাসা কর" (নহল ঃ ৪৪)।

২৩. يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً
فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ

"হে শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা !

তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর এমতাবস্থায় যে, তুমি (তাঁর প্রতি) সন্তুষ্ট এবং তিনিও (তোমার প্রতি) সন্তুষ্ট।

সুতরাং, তুমি আমার বান্দাগণের মধ্যে প্রবেশ কর, এবং প্রবেশ কর তুমি আমার জান্নাতে" (ফজর ঃ ২৮-৩১)।

২৪. اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ

"তিনিই আল্লাহ্‌ যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের রিয্‌ক্‌ দিয়েছেন, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে মৃত্যু দিবেন, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জীবিত করবেন" (রুম ঃ ৪১)।

২৫. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ

"উহার (পৃথিবীর) উপরে যা কিছু আছে সবই নশ্বর ; এবং অবিনশ্বর হয়ে থাকবে (কেবল) তোমার প্রভু – প্রতিপালকের সত্তা, যিনি প্রতাপ ও সম্মানের অধিপতি" (আর রহমান ঃ ২৭, ২৮)।

২৬. اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّنَهَرٍ فِيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ

"নিশ্চয় মুত্তাকীগণ জান্নাতসমূহের এবং নহরসমূহের মধ্যে থাকবে,

এক চিরস্থায়ী সম্মানজনক বাসস্থানে, সর্বশক্তিমান মহাসম্রাটের সান্নিধ্যে" (কমর ঃ ৫৫, ৫৬)।

২৭. إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ۝ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ۖ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ۝

"নিশ্চয় যাদের সম্বন্ধে পূর্ব থেকেই আমাদের পক্ষ থেকে কল্যাণ অবধারিত করে দেওয়া হয়েছে তাদেরকে তা (দোযখ) থেকে দূরে রাখা হবে ; তার সামান্যতম শব্দও তারা শুনবে না; এবং (পক্ষান্তরে) তারা সেই অবস্থায় চিরকাল থাকবে যা তাদের হৃদয় আকাঙক্ষা করবে" (আল্ আম্বিয়া ঃ ১০২, ১০৩)।

২৮. أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ

"যেখানেই তোমরা থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, যদিও তোমরা সুদৃঢ়-দুর্গে অবস্থান কর না কেন;" (নিসা ঃ ৭৯)।

২৯. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۚ

"এবং রসূল তোমাদেরকে যা দান করে তা গ্রহণ কর, এবং যা তোমাদেরকে নিষেধ করে তা থেকে তোমরা বিরত থাক;"(আল্ হাশর ঃ ৮)।

৩০. أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ ۗ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ۝

"অথবা তুমি আকাশে আরোহণ কর এবং আমরা তোমার (আকাশে) আরোহণে কখনও বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি আমাদের উপর কোন কিতাব অবতীর্ণ কর যা আমরা পাঠ করতে পারি'। তুমি বল, 'আমার প্রভু-প্রতিপালক পবিত্র। আমি কেবল একজন মানব-রসূল" (বনী ইসরাঈল ঃ ৯৪)।

৩১. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ

"এবং (স্মরণ কর) যখন ঈসা ইবনে মরিয়ম বলেছিল, হে বনী ইসরাঈল! নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র রসূল, উহার (ভবিষ্যদ্বাণীর) সত্যায়ণকারীরূপে যা তওরাত থেকে আমার সম্মুখে আছে এবং এমন এক রসূলেরও সুসংবাদদাতারূপে, যে আমার পরে আসবে, তার নাম হবে আহ্‌মদ" (সাফ্‌ফ ঃ ৭)।

(ষোল)

উল্লিখিত আয়াতসমূহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা

১ থেকে ৩নং উদ্ধৃতি আয়াতগুলির আলোচনা আমরা করে এসেছি এই পুস্তকের ১৬ থেকে ১৯ পৃষ্ঠায়। এখানে সুধী পাঠকগণের জন্য এতটুকু বলাই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি যে, 'ওফাৎ' শব্দের অর্থ যে মৃত্যু–স্বাভাবিক মৃত্যু, তা কোরআন করীমের অন্যান্য আয়াত থেকেও প্রমাণিত। এবং 'রাফা' অর্থ যে মর্যাদাসম্পন্নরূপে মানবাত্মার (মানবদেহের নয়) উর্ধ্বগতি লাভ করা বা আল্লাহ্‌র দিকে উন্নীত হওয়া, তা-ও কোরআন করীম থেকেই প্রমাণিত। যেমন, –

ক) قُلْ يَتَوَفّٰكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ

"তুমি বল, মৃত্যুর ফেরেশ্‌তা (মালাকুল মউত), যাকে নিযুক্ত করা হয়েছে তোমাদের উপর, নিশ্চয় (সে) তোমাদের জান কবয করবে (ওফাৎ ঘটাবে)"; (সাজদা ঃ ১২)।

খ) وَ لٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰكُمْ

"বরং আমি সেই আল্লাহ্‌র ইবাদত করি যিনি তোমাদের মৃত্যু (ওফাৎ) দান করেন . . . ." (ইউনুস ঃ ১০৫)।

গ) حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ

'যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু ঘটে' (নিসা ঃ ১৬)।

(until death overtake them : M. Pickthall).
(until death overtake them : Sher Ali).

ঘ) حَتّٰٓى اِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ

"যে পর্যন্ত না তাদের নিকট আমাদের রসূলগণ (অর্থাৎ ফেরেশ্‌তাগণ) তাদের প্রাণ বের করার জন্য তাদের নিকট উপস্থিত হবে . . . .'(আল্ আ'রাফ ঃ ৩৮)।

ঙ) حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا

"এমন কি যখন তোমাদের কারও উপরে মৃত্যু আসে, তখন আমাদের প্রেরিতগণ (ফেরেশ্‌তাগণ) মৃত্যু (ওফাৎ) দেয় . . . . (আল্ আনআম ঃ ৬২)।

(When death comes to anyone of you, our messengers take his soul . . . Sher Ali)

(When death comes to one of you, our messengers cause him to die . . . Mohammad Ali).

ইত্যাদি, আরও অনেক আয়াত থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, 'ওফাৎ-এর অর্থ মৃত্যু – মৃত্যু দান করা, জান কবয্ করা, আত্মা নির্গত করা। এবং 'রাফা' শব্দের অর্থ হচ্ছে আত্মার উর্ধ্বগতি, আত্মাকে উন্নীত করা অর্থাৎ মর্যাদাসম্পন্ন করে উন্নীত করা। সশরীরে জীবিত অবস্থায় উর্ধ্বগতি লাভ করা বা আল্লাহ্‌র দিকে উন্নীত হওয়া নয়। আল্লাহ্‌র যেহেতু, কোন প্রকার বস্তুদেহ নেই, সেহেতু, বস্তুদেহ নিয়ে মানুষের পক্ষে তাঁর কাছে যাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। এবং, এ তো জানা কথাই যে, আত্মার উর্ধ্বগতি বা অধঃগতি হয়, মৃত্যুর পরেই। . . . . . অতএব, ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর পরেই তাঁর আত্মা আল্লাহ্‌র দিকে উন্নীত হয়েছে, মৃত্যুর পূর্বে নয়। এবং তাঁর মৃত্যু হয়েছে স্বাভাবিকভাবে সম্মানের সঙ্গে। কোন অভিশপ্ত মৃত্যু তিনি বরণ করেন নি, যেমনটা ধারণা করে ইহুদীরা ও খৃষ্টানরা।

হযরত ইদ্‌রীস (আঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ . . .

'আমরা তাকে অতি উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছিলাম'–(মরিয়ম ঃ৫৮)। 'রাফা' অর্থ যদি হয় – জীবিত অবস্থায় সশরীরে উন্নীত করা, তাহলে, ঈসা (আঃ)-এর সঙ্গে সঙ্গে ইদ্‌রীস (আঃ)-এরও পুনরাগমনের জন্য প্রতীক্ষা করতে হবে। এবং ইদরীস (আঃ) পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করে, কোন্ শরীয়ত পালন করবেন. নবী হবেন না উম্মতি হবেন, না কি উম্মতি নবী হবেন –তা নিয়ে তখন সমস্যা আরও বাড়বে। কাজেই, ইদরীস্ (আঃ)-এর যে 'রাফা' হয়েছে, তা তাঁর মৃত্যুর পরেই হয়েছে। এবং ঈসা (আঃ)-এরও তা-ই হয়েছে।

৪নং আয়াত অর্থাৎ 'ওয়া ইম্মান আহ্‌লাল কিতাব . . .' আয়াতের প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করতে না পারার দরুন কেউ কেউ মনে করে যে, এই আয়াতে ঈসা (আঃ)-এর জীবিত থাকার কথা বলা আছে; কেননা, এখানে বলা হয়েছে যে, ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর পূর্বে সকল আহলে কিতাব অর্থাৎ কিতাবধারীগণ – ইহুদী ও খৃষ্টানগণ তার উপরে ঈমান আনবে। সুতরাং, ঈসা (আঃ) ততদিন পর্যন্ত জীবিত থাকবেন যতদিন না সমস্ত আহলে কিতাব তাঁর প্রতি ঈমান আনবে।

এটাই যদি হয় এই আয়াতের অর্থ ও তাৎপর্য, তাহলে, প্রশ্ন ওঠবে যে, ঈসা (আঃ)-এর পুনরায় নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যে সকল আহলে কিতাব

মারা গেছে এবং মারা যাবে, তাদের কী হবে ? তারাও কি আবার সবাই জীবিত হয়ে উঠবে এই পৃথিবীর বুকে ? এ-ও কি সম্ভব ? না, সম্ভব নয়। অতএব, এই অর্থ ও তাৎপর্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

আর যদি, এই অর্থ ও তাৎপর্যই গ্রহণ করা হয়, তাহলে মানতে হবে যে, দাজ্জালও ঈসা (আঃ)-এর উপরে তখন ঈমান আনবে। কেননা, আহলে কিতাবদের মধ্য থেকেই দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে বলে কথা আছে। এবং ঈমান আনার পর দাজ্জাল তো আর দাজ্জাল থাকবে না। সেক্ষেত্রে, ঈসা (আঃ) তাকে আর বধ করতে পারবেন না। ফলে, তাঁর (আঃ) আগমনের গোটা মিশনটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। এছাড়া, মুসলিম শরীফের হাদীসে পরিষ্কার বলা আছে যে, আহলে কিতাব-এর সত্তুর হাজার লোক দাজ্জালের সঙ্গী হবে এবং তাদের প্রায় সবাই কাফের অবস্থাতেই মৃত্যু বরণ করবে। কাজেই, আহলে কিতাব-এর প্রতিটি ব্যক্তি স্ব স্ব মৃত্যুর পূর্বে ঈসা (আঃ)-এর উপরে ঈমান আনবে, এই কথাটা স্রেফ একটা বাজে কথা।

উপরন্তু, 'ইয়া ঈসা ইন্নি মুতাওয়াফ্‌ফিকা. .' আয়াতে বলা হয়েছে যে, ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীদেরকে তাঁর অস্বীকারকারীদের উপরে কেয়ামতকাল পর্যন্ত প্রাধান্য দান করবেন আল্লাহ্‌তাআলা। অতএব, ইহুদীরা, সংখ্যায় অল্প হোক আর বেশী হোক, কেয়ামত পর্যন্ত থেকে যাবে। কাজেই, আহলে কিতাব-এর সকলেই ঈমান আনবে, এই কথাটা একটা ভিত্তিহীন কল্পিত কথা। আরও বলা হয়েছে ঃ

– 'সুতরাং আমরা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে পরস্পর শত্রুতা ও বিদ্বেষ সংক্রামিত করে দিয়েছি' (আল্ মায়েদা ঃ১৫)। অর্থাৎ, ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ বিদ্যমান থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত। অতএব, আহলে কিতাব-এর সকলেই ঈসা (আঃ)-এর উপরে ঈমান আনবে, এই কথাটার মধ্যে না আছে কোন যৌক্তিকতা, না সত্যতা।

আসলে, আলোচ্য আয়াতে যা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে, আহলে কিতাব-এর প্রত্যেক ব্যক্তি–তা সে ইহুদী হোক বা খৃষ্টান হোক – তার নিজের মৃত্যুর পূর্বে এটাই বিশ্বাস রাখবে যে, ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু ঘটেছে ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায়। যদিও, তাদের উভয়েরই এই বিশ্বাসটা ভ্রান্ত। এবং তাদের এই বিশ্বাসের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দান করবেন ঈসা (আঃ) কেয়ামতের দিনে। কেননা, তাঁর মৃত্যু হয়েছে স্বাভাবিকভাবে, এবং তাঁর আত্মা উন্নীত হয়েছে আল্লাহ্‌র দিকে।

উদ্ধৃত ৫নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, ঈসা (আঃ) এবং তাঁর মা উভয়েই পূর্বে খাদ্য গ্রহণ করতেন, এখন করেন না। তাঁর মা এখন আর খাদ্য গ্রহণ

করেন না এজন্যই যে, তিনি মারা গেছেন; এবং ঈসা (আঃ)-ও এখন আর খাদ্য গ্রহণ করেন না সেই একই কারণে যে, তিনিও মারা গেছেন। এই আয়াতে ব্যবহৃত (কানা) শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে অতীত কালের কথা ভবিষ্যতের কথা নয়। অতএব, প্রমাণিত সত্য এটাই যে, হযরত মরিয়ম এবং তাঁর পুত্র ঈসা (আঃ) উভয়েই মারা গেছেন।

৬নং আয়াত থেকেও এটাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌র কোনও প্রেরিত পুরুষই না খেয়ে বাঁচতে পারতেন না। অতএব, আল্লাহ্‌র এই অটল রীতি-নিয়ম বা সুন্নাতুল্লাহ্‌র খেলাফে বা বিরুদ্ধে কোনও রসূলই–কেহই বহুকাল ধরে বেঁচে থাকতে পারেন না। ঈসা (আঃ)-ও না। অতএব, তিনি মারা গেছেন। লক্ষ্যণীয় যে, এখানে আল্লাহ্‌তাআলা রসূলগণের কথা বলেছেন, শহীদগণের কথা বলেন নি। শহীদগণ অমর-এই কথার অর্থ এই নয় যে, তাঁরা সশরীরে ইহজগতেই জীবিত অবস্থায় থাকেন এবং খাদ্য গ্রহণ করেন। 'আসহাফে কাহাফ'-এর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য; তাঁরাও শহীদ-এর ন্যায় জীবনের অধিকারী। ইহজাগতিক জীবনের প্রতি যার আকর্ষণ অধিকতর, তার পক্ষে তো শহীদ কেন সালেহ হওয়াও সম্ভব নয়।

৭নং – এই আয়াতের আলোচনা আমরা করে এসেছি এই পুস্তকের ২৭, ২৮ ও ২৯ পৃষ্ঠায়।

৮নং – এই আয়াত থেকেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, হযরত রসূলে পাক (সাঃ)-এর পুর্বেকার সকল নবীই ইন্তেকাল করে গেছেন। অতএব, ঈসা (আঃ)-ও ইন্তেকাল করেছেন। এবং পরে রসূলে করীম (সঃ)-ও ইন্তেকাল করেছেন।

৯নং – এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, পূর্বেকার যে সকল জাতি, যেমন – আদ ও সামূদ জাতি – গত হয়ে গেছে (ক্বদ খলাত), সেগুলি আর প্রত্যাবর্তন করবে না। একইভাবে, ৭নং-এর উদ্ধৃত আয়াতে বলা হয়েছে যে, পূর্বেকার রসূলগণ (আঃ) সকলেই (ক্বদ খলাত) গত হয়ে গেছেন, কেহই আর প্রত্যাবর্তন করবেন না। সকলেই মৃত্যুবরণ করেছেন। ঈসা (আঃ)-ও মৃত্যু-বরণ করেছেন, আর প্রত্যাবর্তন করবেন না। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-ও না।

১০নং – এই আয়াত থেকেও প্রমাণিত হয় যে, ঈসা (আঃ) মৃত্যুবরণ করেছেন। কারণ, জীবিত অবস্থায় তাঁর উপরে যাকাত দান ফরয ছিল। কিন্তু, এখন যদি তিনি আকাশে কোথাও জীবিত অবস্থায় থেকে থাকেন, তাহলেতো সেখানে তিনি যাকাত দিতে পারছেন না। কেননা, সেখানে তো তাঁর সঙ্গে তাঁর উম্মতের লোকেরা জীবিত নেই। আর, জীবিত থেকেও তিনি যদি যাকাত

দানে বিরত থাকেন, তাহলে, সেক্ষেত্রে তিনি খোতাদাআলার আদেশ অমান্য-কারী হবেন। এবং এটা কোন নবীর পক্ষেই সম্ভব নয়। অতএব, ঈসা (আঃ) জীবিত নেই, না আসমানে, না যমীনে। এছাড়া, ঈসা (আঃ)-এর উপরে নামায তো ফরয ছিল তওরাত ও ইঞ্জিলের পদ্ধতি মোতাবেক। কিন্তু, তিনি যদি পৃথিবীতে অবতরণ করেন এবং কোরআনী শরীয়ত অনুসারে, একজন উম্মতি হয়ে, ইসলামী পদ্ধতিতে নামায পড়েন, তাহলে, সেক্ষেত্রে তিনি (আঃ) তাঁর উপরে বাধ্যকর যে তওরাতের শরীয়ত, স্বেচ্ছায় তার লংঘনকারী হবেন। এটা একজন নবীর পক্ষে অসম্ভব। অতএব, ঈসা (আঃ) না পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করবেন, না আঁ-হযরত (সঃ)-এর একজন উম্মতি হবেন।

১১নং – এই আয়াতে হযরত ঈসা (আঃ)-এর জিন্দেগীর তিনটি ঘটনার কথা বলা হয়েছে। তাঁর জন্ম, তাঁর মৃত্যু এবং তাঁর পুনরুত্থান। কিন্তু, যাঁরা ধারণা করেন যে, ঈসা (আঃ) অদ্যাবধি আকাশে বেঁচে আছেন, এবং একদিন ভূ-পৃষ্ঠে নেমে আসবেন, তাঁদের ধারণা মেনে নিলে, বলতে হবে যে, আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর নবী ঈসার জীবনের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করতে ভুলে গিয়েছিলেন। অথচ, এই দু'টি ঘটনাই–অর্থাৎ তাঁকে আকাশে সশরীরে জীবিতাবস্থায় উঠিয়ে নেওয়া, এবং একই অবস্থায় পুনরায় পৃথিবীর বুকে অবতীর্ণ করা-এই দু'টি ঘটনাই তাঁকে অন্যান্য সমস্ত নবী-রসূলের থেকে স্বতন্ত্র এক মর্যাদায় ভূষিত করেছে। অথচ, খোদা এই দু'টো ঘটনার একটার কথাও স্মরণ রাখতে পারলেন না ? (নাউযুবিল্লাহ্)। খোদা তাঁর পবিত্র সত্তা সম্পর্কে এই ধরনের কুধারণা পোষণ থেকে আমাদেরকে সদা বাঁচিয়ে রাখুন। আসলে, ঈসা (আঃ) সম্পর্কে, আকাশে উঠিয়ে নেওয়া এবং আবার পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়া, এই উভয় ধারণাই উদ্ভট কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

১২নং – এই আয়াত থেকেও প্রমাণিত হয় যে, ঈসা (আঃ) আজ প্রায় দু'হাজার বছর ধরে বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে, সুন্নাতুল্লাহ্ অনুসারে, তিনি নিশ্চয়ই দারুণভাবে জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছেন এবং জ্ঞানহারা হয়ে পড়েছেন। কিন্তু তা সম্ভব নয়। কেননা, খোদাতাআলা তাঁর কোন নবীকেই অমন জ্ঞানশূন্য বা নাদান ও অথর্ব অবস্থায় উপনীত করে মৃত্যু দেন নি। এবং খোদা তাঁর নিজ সুন্নতের খেলাপও করেন না। "অতএব, তুমি আল্লাহ্‌র নিয়মে আদৌ কোন পরিবর্তন পাবে না" (আল্ ফাতির ঃ ৪৪)।

১৩নং – এই আয়াত কোন মানুষকে এই মাটির দেহ নিয়ে আসমানে যাওয়া এবং সেখানে থাকা থেকে প্রতিহত করছে। পৃথিবীতেই মানুষের বাসস্থান, পৃথিবীতেই তার জীবন ধারণ। মাটি থেকেই তার জন্ম, মাটিতেই তার মৃত্যু, মাটির বুকেই তার দাফন, এবং মাটি থেকেই তার পুনরুত্থান।

১৪নং – এই আয়াত থেকেও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর এক সম্মানিত নবী ঈসা (আঃ)-কে শারীরিক দিক থেকে ক্ষয় হয়ে যাওয়ার পূর্বেই অর্থাৎ দৈহিক শক্তি, তাকত ও ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার মত দুরবস্থায় উপনীত হওয়ার পূর্বেই ওফাৎ বা স্বাভাবিক মৃত্যু দান করেছেন।

১৫নং – এই আয়াতও এই প্রমাণ দিচ্ছে যে, কোন মানুষই তা তিনি সাধারণ মানুষ বা নবী-রসূল, যে-ই হোন না কেন – খোদার সৃষ্ট প্রাকৃতিক নিয়ম-এর বাইরে নন। কাজেই, এই আয়াতের শানে বলতে হবে যে, ঈসা (আঃ) পরিণত বয়সে মারা গেছেন। ইহুদী ও খৃষ্টানদের বিশ্বাস অনুযায়ী তিনি (আঃ) ৩৩ (তেত্রিশ) বছর বয়সে মারা যান নি, না ক্রুশে না অন্য কোনভাবে।

১৬নং – এই আয়াতেও বলা হয়েছে যে, পার্থিব জীবন প্রাকৃতিক নিয়ম (Natural Law) -এর অধীন। এই প্রাকৃতিক নিয়ম লংঘন করার ক্ষমতা মানুষের নেই, ঈসা (আঃ)-এরও ছিল না। যে যামানায় একজন মানুষের গড় আয়ু, ধরুন, নব্বই বছর ছিল। ঈসা (আঃ) না হয়, দীর্ঘায়ূ লাভ করেছিলেন। কিন্তু, সেই দীর্ঘায়ু তো শত শত বৎসর হতে পারে না। অতএব, তিনি (আঃ) মারা গেছেন।

১৭নং – এই আয়াতেও প্রাকৃতিক নিয়ম-এর অলংঘনীয়তার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। এই নিয়ম-এর অধীন সব কিছুই, প্রতিটি মানুষ। অতএব, ঈসা (আঃ)-ও এই নিয়ম-এর আয়ত্তে যথা বয়সে ইন্তেকাল করেছেন।

১৮নং – এই আয়াতেও প্রাকৃতিক নিয়ম বা কানুনে কুদরত-এর কথা বলা হয়েছে, যা কেউ লংঘন করতে পারে না।

১৯নং – হযরত রসূলে পাক (সঃ)-কে বলা হয়েছে যে, তিনি যেমন আহার করেন, তেমনি পূর্ববর্তী নবীগণও তাঁর মতই আহার করতেন। কিন্তু, তাঁরা এখন আর আহার করেন না, কারণ, তাঁরা ইহ জগৎ থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করে গেছেন। এবং ঈসা (আঃ)-এর ক্ষেত্রেও এর কোন প্রকার ব্যতিক্রম ঘটেনি। অর্থাৎ তিনি আর ইহজগতে নেই এবং ইহ জগতের ন্যায় আহারও করেন না। হাট-বাজারও করেন না।

২০নং – এই আয়াতে অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে যে, ইহুদী, নাসারা, হিন্দু, বৌদ্ধ ও অন্যান্য সকলেই, যাদেরকে, খোদা ছাড়া, উপাস্যরূপে ডাকে বা পূজা করে তারা (সেই উপাস্যরা) সবাই মৃত। অতএব, খৃষ্টানরা যে ঈসা (আঃ)-কে খোদার পুত্র খোদা বানিয়েছে এবং তাঁকে তাদের তিন খোদার

এক খোদা বানিয়ে পূজা করছে তিনিও (আঃ) মৃত। কোরআন করীমের এই আয়াত পাঠ করার পরও কেউ যদি মনে করে যে, ঈসা (আঃ) আজও পর্যন্ত বেঁচে আছেন, তাহলে তার জন্য আফসুস করা ছাড়া উপায় কি ?

২১ – 'খাতামান্নাবীঈন' – সংক্রান্ত এই আয়াতে করীমায় এই কথা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আঁ হযরত (সঃ)-এর আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে পূর্ববর্তী নবীগণের আগমনের সিলসিলা বা ধারা শেষ হয়েছে এবং তাঁদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও শেষ হয়েছে। আঁ-হযরত (সঃ)-এর জন্য তাঁদের সাহায্য সহযোগিতারও কোন প্রয়োজন নেই। আঁ-হযরত (সঃ)-এর পূর্ণতম শরীয়ত-এর প্রতিষ্ঠা ও প্রচার-প্রসারের জন্য পূর্ববর্তী এক অপূর্ণ শরীয়তের আনুগত্যকারী একজন নবীর সাহায্য সহযোগিতার প্রয়োজন পড়বে, এমন ধারণা অযৌক্তিক এবং বাতিল এবং তা আঁ-হযরত (সঃ)-এর পূর্ণ ও সর্বোত্তম মর্যাদার পক্ষে হানিকর। অতএব, ঈসা (আঃ)-এর পুনরাগমনের ধারণাটা কষ্ট-কল্পিত বা দুষ্ট-চিন্তা প্রসূত। কেননা, তা রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর অনন্য শান ও মকামের পরিপন্থী। অতএব, এই ভ্রান্ত ধারণাটা বর্জন করাই বাঞ্ছনীয় এবং মঙ্গলজনক। বরং, আমাদের রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এত বড় নবী যে, তাঁর পূর্ণ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে তাঁর উম্মতে ঈসা (আঃ)-এর মত ছোট নবী তৈরী হতে পারে এবং হয়েছেনও। অন্ততঃ একজনের ঘোষণা তো তিনি (সঃ) স্বয়ং দিয়ে গেছেন। অতএব, যাঁর উম্মতে ঈসা তৈরী হতে পারে, তিনি পূর্ববর্তী ঈসার মুখাপেক্ষী হবেন কেন ? হাস্যকর ব্যাপার হচ্ছে, যাঁরা অপযুক্তির মার প্যাঁচ কষে জোর গলায় প্রচার করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) শেষ নবী, তাঁর পরে আর কোন নবী নেই, তাঁরাই আবার পূর্ববর্তী উম্মতের নবী ঈসা (আঃ)-এর পুনরাগমনের ব্যর্থ প্রতীক্ষায় আকাশের দিকে তাকিয়ে অযথা দিন গুণ্ছেন।

২২নং – এই আয়াতের নির্দেশ মতে যদি ইহুদী ও খৃষ্টানদের কেতাবগুলির মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়, তাহলেও দেখতে পাওয়া যাবে যে, পূর্ববর্তী কোন নবীর পুনরায় নাযিল হওয়ার তাৎপর্য কী ! ইহুদীরা বিশ্বাস করতো যে, মসীহ্-এর আগমনের পূর্বে এলিজা (এলিয় বা এলিয়াস) আসমান থেকে অবতরণ করবেন। কেননা, খোদা এলিজাকে জীবিতাবস্থায় সশরীরে আকাশে তুলে নিয়েছেন। তাদের এই বিশ্বাসের ভিত্তি যে কথাটি তা হলো ঃ

"এবং এলিজা ঘূর্ণিবায়ুতে আকাশে উঠে গেলেন" (২ রাজা ঃ ২ঃ১১)। এই শ্লোকটির বাহ্যিক ও আক্ষরিক অর্থের উপরেই জোর দিতেন ইহুদী আলেমরা। তাঁরা, তাই, বিশ্বাস করতেন যে, খৃষ্টের আবির্ভাবের পূর্বে এলিজা স্বর্গ থেকে সশরীরে নেমে আসবেন এই পৃথিবীতে। পক্ষান্তরে, যীশুর দাবী

ছিল যে, বিষয়টা রূপক, এর ভাষা প্রতীকি এবং তা আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করলে ভুল করা হবে। তিনি, তাই, ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে, যাকারিয়ার পুত্র যোহন বা ইয়াহ্ইয়া-এর মধ্যে এলিজার পুনরাগমনের বিষয়টা পূর্ণতা পেয়েছে। কাজেই, এলিজার আকাশ থেকে অবতরণ করার অর্থ এই নয় যে, তিনিই পুনরায় পৃথিবীর বুকে অবতীর্ণ হবেন। এটা সম্ভব নয়, কারণ তিনি মৃত্যুবরণ করেই ইহলোক ত্যাগ করেছেন।

যীশু নিশ্চিতরূপেই জানতেন যে, এলিজার পুনরাগমন পূর্ণ হয়েছে যোহনের আবির্ভাবে। এবং যোহন স্বর্গ বা আসমান থেকে অবতীর্ণ হননি, জন্ম গ্রহণ করেছেন এই পৃথিবীর বুকেই।

ইহুদীরা যীশুকে প্রশ্ন করেছিল –

'আলেমরা তাহলে, কেন বলেন যে, 'অবশ্যই এলিজা প্রথম আগমন করবেন ?'

এর উত্তরে যীশু বলেছিলেন, –

'অবশ্যই, এলিজা আসবেন, এবং তাঁকে সমস্ত কিছু পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে। কিন্তু, আমি তোমাদের বলছি, এলিজা এসে গেছেন। আর, লোকেরা তাঁকে চিনতে পারেনি। লোকেরা তাঁর সঙ্গে যাচ্ছে-তাই ব্যবহার করেছে। একইভাবে, মনুষ্যপুত্রকেও লোকেদের হাতে কষ্টভোগ করতে হবে। তখন, শিষ্যরা বুঝতে পারলো যে, তিনি তাদের কাছে যোহন বাপ্টিস্ট (বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহ্ইয়া)-এর কথা বলছেন" (মথি ঃ ১৭ঃ১০-১৩)।

সুতরাং, পূর্ববর্তী কেতাবগুলো থেকেও এটাই প্রমাণিত যে, স্বর্গ বা আকাশ থেকে কেউ সশরীরে নেমে আসেন না। কারো যদি পুনরাগমনের কথা থাকে, তবে তা বলা হয় রূপকভাবে এবং তা পূর্ণ হয় অন্য কারো আগমনের মাধ্যমে, কোন সদৃশ বা মসীল-এর আগমনে।

২৩নং – এই আয়াতে করীমায় বলা হয়েছে যে, মৃত্যুর পরে শান্তি প্রাপ্ত আত্মা জান্নাতের মধ্যে জান্নাতবাসীগণের সঙ্গী হয়। মৃত্যুর পূর্বে কেউ জান্নাতবাসী হয় না। মে'রাজ-এর বিবরণে বুখারী শরীফের হাদীসে বলা হয়েছে যে, আঁ-হযরত (সঃ) ঈসা (আঃ)-কে জান্নাতবাসীগণের মধ্যে দেখেছেন। অতএব, মৃত্যুর পরেই ঈসা (আঃ) জান্নাতে প্রবেশ করেছেন।

২৪নং – এই আয়াতে মানবজীবনের চারিটি পর্যায় বা অবস্থার কথা বলা হয়েছে। এবং এটাই আল্লাহ্তাআলার সৃষ্ট কানুনে কুদরত বা প্রাকৃতিক নিয়ম। এই নিয়মের আওতায়–মানুষ জন্মগ্রহণ করে, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, মৃত্যুবরণ

করে এবং পুনরুত্থিত হয়। এর কোনও ব্যতিক্রম ঘটে না, কখনও ঘটেনি। ঈসা (আঃ)-এর জীবনেও না। কেননা, সুন্নতুল্লাহ্‌র কোন ব্যতিক্রম নেই, ব্যত্যয় নেই।

২৫নং – পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্ট – যা কিছু সৃষ্টি হয়, তা সবই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, লয়প্রাপ্ত হয়। মানবদেহ সৃষ্টির ক্রমবিকাশের বা বিবর্তনের ধারায় একটা পূর্ণত্বে উপনীত হয়। অতঃপর, তা ক্রমশঃ ক্ষয় হতে থাকে এবং অবশেষে লয়-এর স্তরে উপনীত হয় এবং লয়প্রাপ্ত হয়। সকল বস্তু বা দেহের অভ্যন্তরে সৃষ্টির এবং লয়ের একটা অব্যাহত ধারা আবর্তিত হতে থাকে। সৃষ্টির ও লয়ের এই ধারার একটা পরিসমাপ্তি ঘটে মৃত্যুর সঙ্গে, সেই মৃত্যু আকস্মিক বা অস্বাভাবিক (unnatural) হলেও। এবং তা আর কোনও প্রকারেই প্রত্যাবর্তিত হয় না। এ কারণেও, পুনর্জন্ম বা জন্মান্তরের ধারণাটা একটা বাতিল ধারণা। স্বাভাবিক অবস্থায় জন্মের পর নবজাতক শৈশব, কৈশোর ও যৌবন পযন্ত সৃষ্টির বিকাশের ধারায় বর্ধিষ্ণু থাকে, অতঃপর, ক্ষয়িষ্ণুতার ধারা প্রবলতর হয় এবং দেহ ক্ষয় হতে থাকে। অবশেষে, লয়-এর পর্যায়ে পৌঁছে যায়, লয় হয়ে যায়। সৃষ্টি ও লয়-এর এই বিবর্তন ও আবর্তন ও নিপতন থেকে কেউই স্বতন্ত্র নয়, মুক্ত নয়। সবাই এই প্রাকৃতিক নিয়ম বা কানুনে কুদরত-এর আওতাধীন। ঈসা (আঃ)-ও আওতাধীন। অতএব, তাঁরও দেহ গঠনের পূর্ণত্বে পৌঁছার পর ক্ষয়ের ধারা থেকে মুক্ত ছিল না, এবং তা প্রাকৃতিক নিয়মে যথাসময়ে লয়প্রাপ্তির স্তরে পৌঁছে গেছে। সময়-এর বা মহাকাল-এর এই প্রভাব থেকে কেউই মুক্ত নয়। ঈসা (আঃ)-ও নন। অতএব, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন এবং স্বাভাবিকভাবেই।

২৬নং – এই আয়াতে একটা বিষয় পরিষ্কার ব্যক্ত করা হয়েছে যে, জান্নাতে থাকার অর্থই খোদাতাআলার কাছে থাকা। অন্য কথায়, খোদার সান্নিধ্যে উপনীত হওয়ার অর্থ হচ্ছে জান্নাতে প্রবেশ করা। এবং এটা তো জানা কথাই যে, জান্নাতে প্রবেশ করে মানুষ মৃত্যুর দুয়ার দিয়েই, অন্য কোন উপায়ে নয়। অতএব, بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ –এর অর্থ যখন করা হয় যে, ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে তুলে নেওয়া হয়েছে তখন তো এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তিনি (আঃ) মৃত্যুর পরেই আল্লাহ্‌র দিকে উন্নীত হয়েছেন। বলা বাহুল্য, 'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন' এর 'ইলায়হে', এবং 'বার্ রাফাআহুল্লাহু ইলায়হে'-এর 'ইলায়হে'–সমার্থক' ও সমান তাৎপর্যবহ।

খোদার দিকে উন্নীত হয়ে কেউ আর পৃথিবীর দিকে পতিত হয় না। হতে চাইলে বা হতে হলে তাকে জন্মান্তর বা পুনর্জন্মের মধ্য দিয়ে হতে হবে। কিন্তু, জন্মান্তর বা পুনর্জন্ম মানলে, এটাও মানতে হবে যে, খোদা পাপ ক্ষমা করতে পারেন না। আর পাপ ক্ষমা করতে না পারলে তিনি প্রভুত্বের অধিকারী হন না। আর প্রভুত্বের অধিকারী না হলে তিনি উপাস্য হতে পারেন না। আর উপাস্য হতে না পারলে ....মানে কথা হচ্ছে কি, শেষ পর্যন্ত খোদার আর খোদা-ই থাকা হয় না। তখন, আর ঈসা (আঃ)-এর কেন, কারোই আর খোদার দিকে যাওয়ার প্রশ্ন থাকবে না। কিন্তু, তা কি হয় ? হয় না।

২৭নং – এই আয়াত দু'টির পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যদের উপাসনা করে, তারা এবং তাদের উপাস্যরা সবাই জাহান্নামী। কিন্তু, তাদের এই সকল উপাস্যদের মধ্য থেকে যাদের জন্য পূর্ব থেকেই কল্যাণ অবধারিত রয়েছে, এবং যারা নিজেরা উপাস্য হওয়ারও কোন প্রকার দাবী করেন নি, যেমন, উযায়ের (আঃ)-এবং ঈসা (আঃ)-তাঁরা জান্নাতী। অতএব, উযায়ের (আঃ)-ও জান্নাতী হয়েছেন মৃত্যুর পরে, ঈসা (আঃ)-ও জান্নাতী হয়েছেন মৃত্যুর পরে। বলা বাহুল্য, এই উভয় নবীকেই লোকেরা পূজা করতো এবং এখনও করে। বলা হয়েছে ঃ

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ

“এবং ইহুদীরা বলে উযায়ের আল্লাহ্র পুত্র, এবং খৃষ্টানরা বলে মসীহ্ আল্লাহ্র পুত্র ;” (সূরা তওবা ঃ ৩০)।

এই সকল মুশরেকরা তো শয়তানের দিকে অধঃপতিত, পক্ষান্তরে আল্লাহ্র ঐ নবীরা (আঃ) আল্লাহ্র দিকে উন্নীত।

২৮নং – এই আয়াতেও বলা হয়েছে যে, মৃত্যুর হাত থেকে কারো রেহাই নেই। এটাই সুন্নতুল্লাহ্। এবং সুন্নতুল্লাহ্ অনুযায়ী সময়ের বা কালের প্রভাব সকলের উপরেই সমভাবে কার্যকরী। এর হাত থেকেই কেউ নিস্তার পায় না। ভবিষ্যতেও কেউ নিস্তার পাবে না, অতীতেও কেউ পায়নি। ঈসা (আঃ)-ও না। কেননা, আল্লাহ্র এই চিরন্তন রীতি বা নিয়ম-এর কোনও ব্যতিক্রমের কথা বলেন নি আল্লাহ্। কেননা, তাঁর নিয়ম-এর মধ্যে কোন ব্যতিক্রম নেই।

২৯নং – এই আয়াতের প্রেক্ষিতে আমাদের দেখা উচিত যে, মানুষের হায়াত-মউতের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কি বলে গেছেন। এ ব্যাপারে

মেশকাত শরীফের একটি হাদীস হচ্ছে, – হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করছেন যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের লোকদের বয়স গড়ে ষাট থেকে সত্তুর বছর হবে। হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণিত মুসলিম শরীফের এক হাদীসে আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কসম খেয়ে বলেছেন যে, এই পৃথিবীর বুকে এমন কেউ নেই যে, শত বৎসর গত হয়ে যাবে, তবু জীবিতই থেকে যাবে। এই হাদীসেরও তাৎপর্য এটাই যে, মানুষ শতায়ূ হলেও, তার মাটির দেহ মাটিতেই মিশে যাবে। সে দুশ' চারশ' . . . . হাজার . . . . দু'হাজার বছরের আয়ু পেতে পারে না। তা সে তার মাটির দেহ নিয়ে আকাশে বা পাতালে যেখানেই থাকুক না কেন (যদিও তেমন কেউই নেই)। অথচ, কল্পনা করা হচ্ছে যে, ঈসা (আঃ) দু'হাজার বছর ধরে আসমানে মাটির দেহ নিয়েই বহাল তবীয়তে জীবিত আছেন, এবং পৃথিবীতে পুনরায় ফিরে আসবেন, এবং আবারও চল্লিশ বছর বাঁচবেন। আর যখন বলা হয় যে, সেই ঈসা (আঃ) রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর উম্মতের মধ্যে শামিল হবেন, তখন বেমালুম ভুলে যাওয়া হয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কোন উম্মতির বয়স গড়ে বড় জোর শতবর্ষ হবে, তার বেশী হবে না। কাজেই, ঐ উদ্ভট কল্পনাটাকে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কথার সঙ্গে কেউ যদি খাপ খাওয়াতেই চায়, তাহলে, তাকে স্বীকার করতে হবে যে, ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে নেমে এসেছিলেন এবং কমবেশী এক শ' বছর বেঁচে থাকার পর মারা গেছেন। অন্যথায়, তাকে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর ঐ হাদীসগুলিকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। এবং সেক্ষেত্রে আমাদের কোন মন্তব্য থাকবে না। কেননা, কোন সহীহ্ হাদীস প্রত্যাখ্যানের সেই দায়িত্ব কেবল তারই।

৩০নং – এই আয়াতে করীমা থেকে জানা যায় যে, কাফেররা আঁ হযরত (সাঃ)-কে সশরীরে আসমানে উঠে যেতে বলেছিল এবং সেখান থেকে এক কিতাব নিয়ে অবতীর্ণ হতে বলেছিল। কিন্তু, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কাফেরদেরকে সেই নিদর্শন দেখাতে অস্বীকার করেছিলেন এই বলে যে, তিনি আল্লাহ্র রসূল বটেন, কিন্তু তিনি তো মানুষ। আর মানুষের পক্ষে তো নিজে নিজেই আসমানে উঠে যাওয়া সম্ভব নয়। এবং আল্লাহ্ও এভাবে কাউকে সশরীরে আসমানে তুলে নেন না। আল্লাহ্ মানুষকে তুলে নেন তার মৃত্যুর পরে তার আত্মাকে। যেমন তিনি তুলে নিয়েছেন পূর্ববর্তী সকল নবীগণকে (আঃ)। তাই, মে'রাজে রসূলুল্লাহ্ তাঁদেরকে দেখেছিলেন আসমানে। এবং তাঁদের মধ্যে দেখেছিলেন ঈসা (আঃ)-কেও।

৩১নং – এই আয়াতের আলোচনা করা হয়েছে এই পুস্তিকার ৫-৭ পৃষ্ঠায়।

মৃত ব্যক্তি পৃথিবীতে ফিরে আসে না।

কোরআন করীমে আল্লাহ্তাআলা বলেছেন ঃ

১. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٣٢﴾

"তারা কি দেখেনি, তাদের পূর্বে আমরা কত জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছি, তারা কখনও তাদের নিকটে ফিরে আসে না ?" (৩৬ঃ৩২)

২. ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴿١٧﴾

"এরপর তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে। অতঃপর অবশ্যই তোমাদেরকে কেয়ামতের দিনে উত্থিত করা হবে" (২৩ঃ১৬,১৭)।
(আরও দেখুন ঃ ২১ঃ১৬; ৩৬ঃ৫১; ৬ঃ২৮)

৩. حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿١٠٠﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ۚ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ۖ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٠١﴾

"এমনকি যখন তাদের কারো মৃত্যু এসে যায় তখন সে বলে, 'হে আমার প্রভু ! তুমি আমাকে ফেরৎ পাঠাও, যেন আমি সেই সমস্ত পুণ্য কর্ম করতে পারি যা আমি (পার্থিব জীবনে) ছেড়ে এসেছি।' কখ্খনো না, এ কেবল একটা মুখের কথা, যা সে বলছে, এবং তাদের পিছনে সেই দিন পর্যন্ত এক পর্দা রয়েছে যখন তারা পুনরুত্থিত হবে" (২৩ঃ১০০, ১০১)।

পবিত্র হাদীস-এর কথা ঃ

১. আকাবায় দ্বিতীয় দফায় বায়আত গ্রহণকারীগণের মধ্যে অন্যতম সাহাবী ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রাঃ)। হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) শাহাদৎ লাভ করেন ওহোদ-এর যুদ্ধে। তাঁর শাহাদতের পর হযরত রসূলে করীম (সাঃ) তাঁর পুত্র জাবের (রাঃ)-কে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে, তোমার পিতার সঙ্গে আল্লাহ্তাআলা কথা বলেছিলেন। আল্লাহ্ খুশী হয়ে তাকে বলেছিলেন, 'হে আমার বান্দা ! তোমার কিছু চাওয়ার থাকলে, চেয়ে

নাও।' তখন তোমার পিতা বলেছিল, 'হে আমার স্রষ্টা ! আমার প্রভু ! আমার মাত্র একটাই আকাঙ্ক্ষা যে, আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে জিন্দা করে পাঠানো হোক যেন আবারও আমি আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হতে পারি।' উত্তরে আল্লাহ্‌ বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই আমি তা করতাম। কিন্তু, আমি এই ফয়সালা পূর্বেই করে রেখেছি যে, কোন মানুষ দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর সে আর কখনও দুনিয়াতে ফিরে আসবে না' (তিরমিযী, মিশকাত)।

২. একবার, এক ব্যক্তি মারা গেলে সাহাবীদের (রাঃ) কেউ কেউ আঁ হযরত (সাঃ)-এর কাছে আরজ করলেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্‌ ! আপনি দোয়া করুন, ও যেন জীবিত হয়ে ওঠে।' উত্তরে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেছিলেন, 'তোমরা তোমাদের সাথীর মাগ্‌ফেরাতের জন্য দোয়া কর, এবং যাও তোমাদের সাথীকে দাফন কর'–(মুসলিম, মিশকাত)।

অতএব, এটা একটা সুস্পষ্ট সত্য যে, মানুষ মারা গেলে এই দুনিয়াতে আর ফিরে আসে না। তা সেই মানুষ সাধারণ কেউ হোক, আর আল্লাহ্‌র কোন নবীই হোন। কাজেই যারা অজ্ঞতার কারণে কিংবা জিদের কারণেও এই কথাটা বলতে চান যে, হযরত ঈসা (আঃ) মারা গেলেও আল্লাহ্‌ তাঁকে আবার জীবিত করে দুনিয়াতে পাঠাবেন, তাঁরা আল্লাহ্‌র নিয়ম-এর বিরুদ্ধে কথা বলেন। কেননা, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ তো স্বয়ং এই অমোঘ সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন যে, কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তিনি তাকে আর কখনই পৃথিবীর বুকে ফেরৎ পাঠাবেন না। এবং আল্লাহ্‌ তাঁর সিদ্ধান্ত পাল্টানও না, ভঙ্গও করেন না। সুতরাং হযরত ঈসা (আঃ) যখন মারা-ই গেছেন তখন এই পৃথিবীতে ফিরে আসার সুযোগ তাঁর আর নেই। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন।

– সমাপ্ত –

একটি কথা

পরিশেষে, প্রত্যেক মুমিন ও মুমিনার কাছে সুবিবেচনার জন্য আমরা সবিনয়ে একটা কথা পেশ করতে চাই। কথাটা হচ্ছে- যদি প্রচলিত এই বিশ্বাসই পোষণ করা হতে থাকে যে, বনী ইসরাঈলীয় নবী ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ) আজও পর্যন্ত আসমানে কোথাও সশরীরে জীবিত আছেন এবং তিনি আসমান থেকে নেমে এসে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে শামিল হবেন এবং তখন তিনি নবী থাকবেন না, থাকবেন একজন অ-নবী উম্মতি হিসেবে এবং এই অ-নবী মর্যাদা নিয়েই তিনি ইসলামের খেদমত করবেন এবং পরে তিনি মৃত্যু বরণ করবেন। তাহলে, এই বিশ্বাসমতে দেখা যাচ্ছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) মারা যাবেন একজন অ-নবী হিসেবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে-

(১) আল্লাহ যাঁকে নবী করে পাঠিয়েছিলেন দুনিয়াতে মৃত্যুর সময়ে তাঁর কি ঈমান ও আমলের ঘাটতি হবে, যার দরুণ তিনি (আঃ) মারা যাবেন একজন অ-নবী হিসেবে?

(২) অ-নবী হিসেবে মারা গেলে ঈসা (আঃ) তো আর পরকালেও নবী থাকবেন না। কেননা, মউতের দুয়ার দিয়ে তিনি তাঁর যে পরিচিতি নিয়ে যাবেন সেই পরিচিতিই তো হবে তাঁর পরকালের পরিচয় নয় কি?

(৩) অ-নবী হিসেবে তাঁর যদি পুনরুত্থান ঘটে তাহলে, আল্লাহ তাঁকে (আঃ) তাঁর উম্মতের পথভ্রষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্কে জবাবদিহি করবেন কি করে? (৫ঃ ১২৭-১১৯) সেটা কি আল্লাহর পক্ষে সঠিক হবে? কিন্তু, প্রিয় ভাই ও বোন! আমরা সবাই তো জানি যে, আল্লাহ্‌র প্রতিটি কাজই সঠিক। অতএব, এটাই সঠিক যে, আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত ঈসা (আঃ)-কে তাঁর উম্মত সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন। কেননা, তিনি (আঃ) আল্লাহ্‌র এক নবী ছিলেন, এবং নবীরূপেই ইন্তেকাল করেছেন আজ থেকে প্রায় দু'হাজার বছর আগে।

(ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)